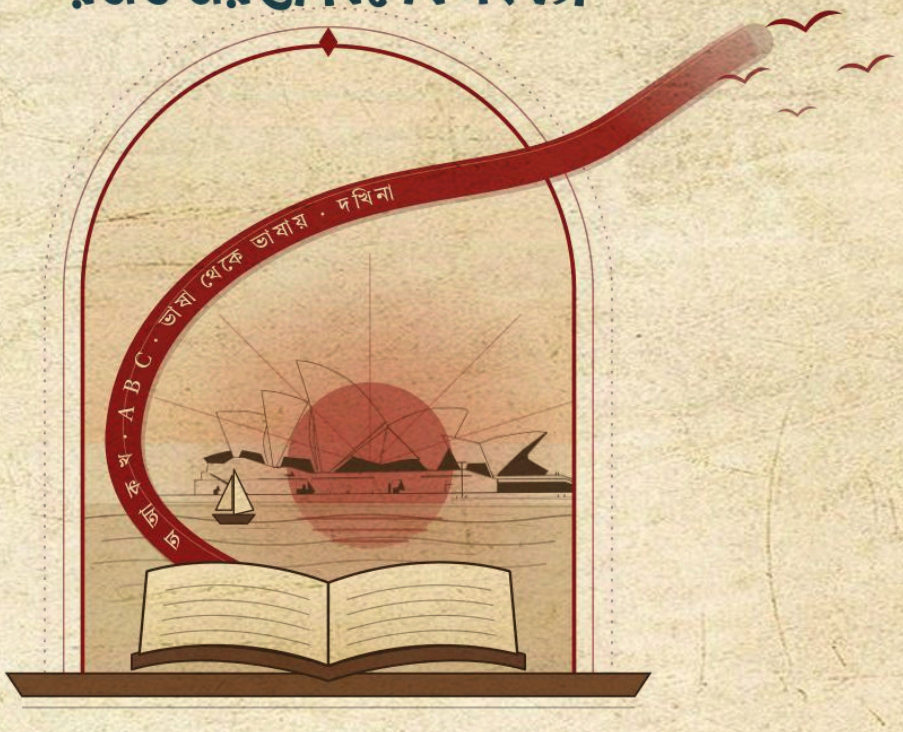
অনিতা অগ্নিহোত্রী সাহিত্য সন্ধ্যা

২৯শে নভেম্বর ২০২৬, সিডনী

‘দখিনা’

২৫
২০০১ – ২০২৬

রজত জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা



সম্পাদক

অনিতা অগ্নিহোত্রী

ব্যবস্থাপনায়

আনন্দধারা

THE STREAM OF JOY

আনন্দধারা ভলান্টিয়ার্স রীডার্স একাডেমী

'দখিনা' রজত-জয়ন্তী স্মারক-পত্রিকা

'দখিনা'

রজত জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদক

অনিতা অগ্নিহোত্রী

দখিনা টীম

শর্মিলা রায়, স্মৃতিশ রায়, সৌমিক বসু, শ্রীমন্ত মুখার্জী !

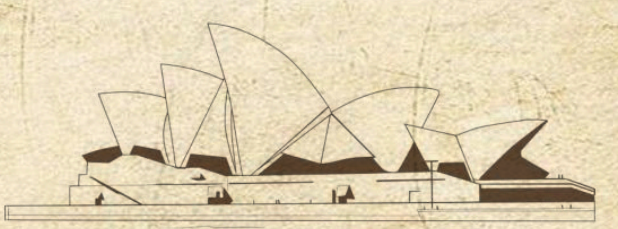
ব্যবস্থাপনা

অনিতা অগ্নিহোত্রী সাহিত্য সন্ধ্যা'র ব্যবস্থাপনায় -

সৌমিক বসু, শাশ্বতী বসু, ইন্দ্রানী দত্ত, সুদীপ্ত বাসু,
গার্গী মুখার্জী, দীপান্বিতা হালদার, অনিশা বিশ্বাস,
জামিল হাসান সুজন, দুলাল হালদার, শৌভিক হালদার !

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলা সাহিত্য সংসদ মেলবোর্ন !
সানি সিং লামা, শিবাজী মিত্র এবং মোহাম্মদ ওবায়েদ !
আনন্দধারা'র তিন দশকের যাত্রাপথের সঙ্গী
অগণিত পাঠক, স্বেচ্ছাসেবী, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ,
এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু
আলাদাভাবে এখানে নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলো না !



'দখিনা' রজত-জয়ন্তী স্মারক-পত্রিকা

সূচিপত্র

১	**সম্পাদকীয়** অনিতা অগ্নিহোত্রী	৪ পৃষ্ঠা
২	**আমাদের কথা - প্রায় তিন দশকের যাত্রা** স্মৃতিশ রায়	৬ পৃষ্ঠা
৩	**সম্পাদকমন্ডলীর তরফ থেকে দখিনা'র ২৫ বছর** শর্মিলা রায়	৯ পৃষ্ঠা
৪	**অনুবাদের জানালায় মুখ রেখে কিছুক্ষণ** পারিজাত ব্যানার্জী	১২ পৃষ্ঠা
৫	**অনুবাদে বাদ যায়, তর্জমাতে হয় জমা** সৌমিক বসু	১৬ পৃষ্ঠা
৬	**সাহিত্যের উৎকর্ষে অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা** শাশ্বতী বসু	২১ পৃষ্ঠা
৭	**সাহিত্য প্রসারে অনুবাদ সাহিত্যের অবদান** শ্রীজীব মুখার্জী	২৬ পৃষ্ঠা
৮	**সাহিত্য প্রসারে অনুবাদ সাহিত্যের অবদান** জামিল হাসান সুজন	৩০ পৃষ্ঠা
৯	**অনুবাদ সাহিত্যের পরিব্যাপ্তি** লুৎফর রহমান খান	৩২ পৃষ্ঠা
১০	**অনুবাদ সাহিত্য, আমার অভিজ্ঞতা এবং মনোভাব** কৌশিক চক্রবর্তী	৩৭ পৃষ্ঠা
১১	**কিছু সত্যি কথা** তানিম মান্নান	৪১ পৃষ্ঠা
১২	**'একটা গোটা গঙ্গা নদী করব অনুবাদ'** ড. শাখাওয়াৎ নয়ন	৪৫ পৃষ্ঠা

'দখিনা' রজত-জয়ন্তী সংখ্যা

সম্পাদকীয়



অনিতা অগ্নিহোত্রী



আনন্দধারা'র ঊনত্রিশতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ স্মারক পত্রিকা দখিনা'র যাত্রা'র রজত-জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে ! ২০০১ সালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দধারা'র আমন্ত্রণে প্রথম অষ্ট্রেলিয়া সফর করেন ! সেই সময় তাঁর হাত ধরে, তাঁরই সম্পাদনায় দখিনা'র যাত্রা শুরু ২০০১ সালে ! আক্ষরিক অর্থেই ২০২৬ দখিনা'র চলার পঁচিশ বছর, রজত-জয়ন্তী ! আনন্দধারা'র উদ্যোক্তাদের তরফে সেই দখিনা পত্রিকা সম্পাদনা'র অনুরোধ আসাতে ব্যস্ততার মধ্যেও চেষ্টা করলাম কিছুটা সময় নিয়ে কাজটি করতে !



সিডনি থেকে প্রকাশিত দখিনা পত্রিকার এবারের বিষয় অনুবাদ সাহিত্য । নানা প্রবন্ধে অনুবাদ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, অনুবাদ-অভিজ্ঞতা, অনুবাদের সীমাবদ্ধতা, মানুষের মধ্যে বন্ধন রচনায় অনুবাদের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবাসীদের জন্য, বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মাতৃভাষার জ্ঞান ও সেই জন্য অনুবাদ সাহিত্য পাঠের প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সূত্রে বিশ্বসাহিত্য ও তার অনুবাদের নানা দিক উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিক্তর য়ুগো, জর্জ অরওয়েল, এমন কি সম্প্রতি বুকার পুরস্কার পাওয়া বানু মুস্তাকের লেখার প্রসঙ্গ এসেছে।

'প্রবাসে বসে এই অনুশীলন বজায় রাখা সহজ নয়...'



নিবন্ধ গুলি পড়লে বোঝা যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁরা নিয়মিত পাঠের অভ্যাস তো রেখেছেন, তাঁদের বাংলা লেখাও যথেষ্ট পরিণত । এর জন্য যথেষ্ট অনুশীলন দরকার। প্রবাসে বসে এই অনুশীলন বজায় রাখা সহজ নয় তা আমি বুঝতে পারি। কারণ আমি নিজেই বাংলা ভাষা বলয়ের বাইরে দু দশক কাল কাটিয়ে সাহিত্য চর্চায় লিপ্ত ছিলাম। দখিনা পত্রিকা র উন্মোচনের সময় আপনাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকব আশা করছি। দখিনা পত্রিকার কার্যনির্বাহী সমিতি ও লেখক লেখিকাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাঁদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও অভিনিবেশের জন্য।

অনিতা অগ্নিহোত্রী।

কলকাতা।

নভেম্বর, ২০২৬।

'দখিনা' রজত-জয়ন্তী স্মারক-পত্রিকা

আমাদের কথা



স্মৃতিশ রায়

আনন্দধারার পথচলা : স্বপ্ন থেকে বাস্তবের দিকে



আনন্দধারার পথচলা : স্বপ্ন থেকে বাস্তবের দিকে



১৯৯৭ সাল। অস্ট্রেলিয়ার বুকে একদল সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পানুরাগী মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে জন্ম হয়েছিল আনন্দধারার। দেশ থেকে বহু দূরে থেকেও বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার প্রতি ভালোবাসাকে হৃদয়ে লালন করেই আমাদের এই পথচলা শুরু।

১৯৯৭ থেকে ২০০০—এই কয়েক বছরে আনন্দধারা আয়োজন করেছে একাধিক সঙ্গীত সন্ধ্যা, নৃত্যানুষ্ঠান ও চিত্র প্রদর্শনী। প্রবাসের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারের সেই প্রয়াস আমাদের সকলকে এক সুতোয় বেঁধেছিল।

এরপর একদিন, একান্ত ঘরোয়া আড্ডায় হঠাৎই উঠে এল এক নতুন ভাবনা। বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ পড়ে আমরা কতই না মুগ্ধ হই! কিন্তু যদি একবার সেই লেখকদের সামনাসামনি পাওয়া যেত, তাঁদের মুখে তাঁদের সাহিত্যভাবনা শোনা যেত, তাঁদের কাছে মনের মধ্যে জমে থাকা প্রশ্নগুলি সরাসরি তুলে ধরা যেত—তবে কেমন হতো?

নিতান্তই ঘরোয়া আড্ডার সেই আলোচনা থেকেই জন্ম নিল এক দুঃসাহসিক স্বপ্ন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যাঁর লেখনী একসময় ঝড় তুলেছিল, সেই দিকপাল সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কেই অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা যাক!

আনন্দধারা তখন আনন্দবাজার গ্রুপ (ABP)-এর অস্ট্রেলীয় প্রতিনিধি হিসেবে যুক্ত থাকায় সুনীলদার সঙ্গে যোগাযোগের পথ কিছুটা সহজ হয়েছিল। কিন্তু তিনি সত্যিই আসতে রাজি হবেন কি না, তা নিয়ে মনে সংশয় ছিল। আমাদের বিস্মিত ও আনন্দিত করে সুনীলদা সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন। ২০০১ সালে তাঁর সেই সফর আনন্দধারার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের জীবনে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি হয়ে রইল।



এরপর আনন্দধারার এই সাহিত্যযাত্রায় যুক্ত হয়েছে একের পর এক উজ্জ্বল নাম ও স্মরণীয় অধ্যায়।

'লেখক ও পাঠকের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক অনন্য সেতুবন্ধন।'

এই দীর্ঘ পথচলায় আনন্দধারার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছেন বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি— এনাদের মধ্যে ছিলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্যে (২০০৬), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (২০০৯), হর্ষ দত্ত (২০১০), অপূর্ব দত্ত (২০১০), সমরেশ মজুমদার (২০১২), তিলোত্তমা মজুমদার (২০১৩, সৌজন্যে বেঙ্গলি এসোসিয়েশন), আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (২০১৪), নবকুমার বসু (২০১৬), শ্রীজাত (২০১৭),ও সুবোধ সরকার (২০১৯)। এছাড়াও আনন্দধারার রজতজয়ন্তী বর্ষ (২০২২) উদ্‌যাপনে আমরা পেয়েছি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তাঁদের প্রত্যেককে ঘিরেই আয়োজিত হয়েছে মনোজ্ঞ সাহিত্যসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমরা যেমন তাঁদের সাহিত্যচর্চা,

জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতার কথা শুনে সমৃদ্ধ হয়েছি, তেমনই তাঁদের সৃষ্টিকে অন্য এক আঙ্গিকে তুলে ধরার সাহসও দেখিয়েছি। তাঁদের লেখা গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য রচনা অবলম্বনে মঞ্চস্থ করেছি নাটক। লেখক ও পাঠকের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক অনন্য সেতুবন্ধন।

আনন্দধারার কর্মকাণ্ড অবশ্য শুধু সাহিত্যসভা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়। শীতের এক অলস দুপুর কিংবা গ্রীষ্মের মায়াময় বিকেলে, সমসাময়িক ও প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে আমরা আয়োজন করি আলোচনা ও বিতর্কসভার। দৈনন্দিন জীবনের চেনা গণ্ডি পেরিয়ে নতুন কিছু জানা, নতুন করে ভাবা এবংপরস্পরের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করার মধ্য দিয়েই আমাদের এই প্রয়াস এগিয়ে চলে।

পেছনে ফিরে তাকালে বুঝতে পারি, ১৯৯৭ সালের সেই ছোট্ট উদ্যোগ আজ কতটা পথ অতিক্রম করেছে। এর প্রতিটি পদক্ষেপের পিছনে রয়েছে অসংখ্য মানুষের আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ভালোবাসা এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ।

আনন্দধারা কখনও কেবল একটি সংগঠনের নাম হয়ে থাকতে চায়নি। আমাদের কাছে আনন্দধারা হলো এক মিলনক্ষেত্র—যেখানে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, চিন্তা ও মননের অবাধ আদানপ্রদান ঘটে। দেশ থেকে দূরে থেকেও শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ অটুট রাখার, নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেওয়ার এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিসরকে আরও সমৃদ্ধ করার এক নিরন্তর প্রয়াস।

স্বপ্ন দেখার শুরুটা হয়েছিল কয়েকজন মানুষের হাত ধরে। সেই স্বপ্ন আজও বেঁচে আছে, আরও অনেক স্বপ্নকে সঙ্গী করে।

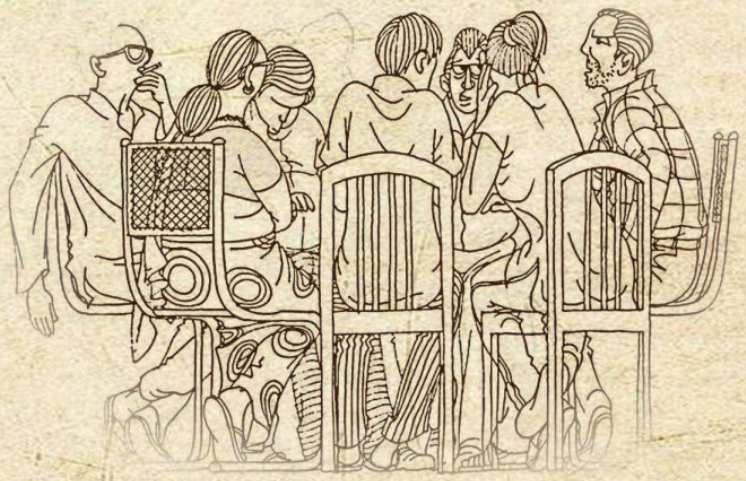
আনন্দধারার এই পথচলা অব্যাহত থাকুক—বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোয়, আগামী দিনেও।

আনন্দধারা ও দখিনা

এক আবেগের পথচলা



শর্মিলা রায়



আনন্দধারা ও দখিনা শর্মিলা রায়



১৯৯৭ স ালে একদল প্রবাসী বাঙালির ভালোবাসা ও সম্মিলিত উদ্যোগে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা এবংপ্রসারের উদ্দেশ্যে হঠাৎই জন্ম হয়েছিল আনন্দধারা প্রতিষ্ঠানটির। দেশ থেকে বহু দূরে থেকেও বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও টান যে কতখানি গভীর, আনন্দধারার ২৯ বছরের অক্লান্ত পথচলা তারই এক উজ্জ্বল প্রমাণ।

২০০১ সালে আমাদের সাহিত্যের আঙিনায় প্রথম পদক্ষেপ। এক ঘরোয়া আড্ডায় হঠাৎই মাথায় এসেছিল এক দুঃসাহসিক চিন্তা - দেশ থেকে কোনো সাহিত্যিক কে আমন্ত্রণ জানালে কেমন হয়? দেশ ছেড়ে এলেও বাংলা সাহিত্য নিয়ে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর নাড়াচাড়া রয়েছে। বাংলার সাহিত্যজগৎ এবং সাহিত্যিকদের নিয়ে কৌতূহল ও জানার আগ্রহও ছিল অপরিসীম। সেই খামখেয়ালি ইচ্ছেরই প্রকাশ ঘটল যখন আমাদের ভীরু আহ্বানে সাড়া দিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে এলেন বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দক্ষিণ গোলার্ধে তাঁর এই প্রথম পদার্পণকে স্মরণীয় করে রাখতে অত্যুৎসাহী আনন্দধারার সদস্যরা স্থির করলেন, এই উপলক্ষে প্রকাশ করা হবে একটি পত্রিকা এবং সুনীল'দা এই পত্রিকা সম্পাদনা করবেন। সেই ভাবনা থেকেই জন্ম হল 'দখিনা' পত্রিকার। সুনীল'দা সম্পাদিত দখিনার প্রথম সংখ্যাটি অস্ট্রেলিয়া ও পৃথিবীর নানা প্রান্তের লেখায় সমৃদ্ধ। প্রতিটি লেখার নীচে সুনীলদার নিজের হাতে লেখা বিশেষ মন্তব্য ও বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। সেই শুরু।

এরপর থেকে 'দখিনা' হয়ে উঠেছে আনন্দধারার সাহিত্যযাত্রার এক বিশেষ স্মারক।

২০০৬ সালে জনপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্যের অস্ট্রেলিয়া সফর উপলক্ষে প্রকাশিত হয় 'দখিনা'র একটি বিশেষ সংখ্যা।

এরপর ২০১৭ সালে কবি শ্রীজাতর প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর এবং আনন্দধারার ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হয় 'দখিনা'। শ্রীজাতর সম্পাদনায় এবং বাতায়নের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত সেই সংখ্যা ছিল আমাদের পথচলার এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

২০১৮ সালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'দখিনা'র সংখ্যাটির বিষয় বস্তু ছিল বাংলা সাহিত্য ২০৫০।

২০২২ সালে আনন্দধারার রজতজয়ন্তী বর্ষ (১৯৯৭–২০২২) উদযাপনে কবি শ্রী বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্ট্রেলিয়া সফর উপলক্ষে, তাঁর সম্পাদনায় 'দখিনা' প্রকাশিত হয় 'আনন্দধারার রজতজয়ন্তী স্মারক পত্রিকা হিসেবে।



আনন্দধারার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক ও লেখক-লেখিকা আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের উপস্থিতি, সাহিত্যচর্চা ও মূল্যবান অবদানে। তাঁদের সান্নিধ্য আমাদের সাহিত্যজগতের প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহকে আরও গভীর করেছে।

দখিনা কোনও নিয়মিত ব্যবধানে প্রকাশিত পত্রিকা নয়। এটি মূলত বিশেষ অনুষ্ঠান,

বিশেষ উপলক্ষ এবং স্মরণীয় সাহিত্যিক মুহূর্তকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সংখ্যার পাতায় আমরা ধরে রাখতে চেয়েছি আমাদের সাহিত্যযাত্রার কিছু মূল্যবান স্মৃতি, বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সৃষ্টির ছোঁয়া এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের একান্ত কিছু মুহূর্ত। দখিনা কখনো কোনো বিষয়বস্তু কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে, আবার কখনো তা হয়নি। আমাদের আগামী দিনের ইচ্ছে দখিনা বিশেষ বিষয়বস্তু নির্ভর করেই রচিত হবে।

আনন্দধারা ও দখিনা—দুটি নাম, অথচ একই স্বপ্ন, একই ভালোবাসা এবংবাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ঘিরে এক নিরন্তর পথচলা।

এই পথচলায় যাঁরা তাঁদের সময়, শ্রম, মেধা ও ভালোবাসা দিয়ে পাশে থেকেছেন দখিনার সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষ থেকে তাঁদের সবাইকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অনুবাদের জানালায় মুখ রেখে কিছুক্ষণ...



পারিজাত ব্যানার্জী



হ্যান – অনুবাদ সাহিত্য বলে সত্যি কিছু কখনও হয় নাকি পারিজাত?

আমি – হঠাৎ এ প্রসঙ্গ তুললে কেন হ্যান? তোমার আগামী কাজ বুঝি অনুবাদ সাহিত্য নিয়েই?

হ্যান – না, না, সেদিন একটা আলোচনা সভায় গিয়েছিলাম আসলে। সেখানে এই নিয়ে খুব তর্ক বেঁধে গিয়েছিল। সেটা মনে পড়তেই প্রশ্নটা মাথায় এলো আবার।

আমি – বুঝলাম। আমার মতে তো অনুবাদ সাহিত্য খুব জরুরি ও প্রয়োজনীয় এক রসদ জীবনের। পৃথিবীর বুকে এতো সংখ্যক মানুষ আমরা। তার উপর আবার সবার আলাদা আলাদা ভাষা আর উপভাষা। মেরে কেটে তার কটাই বা বলতে কিংবা বুঝতে পারি বলোতো এক জীবনে? এই যেমন আমি নিজেকেই ধরি বরং, তুমি তো জানোই, বাংলা আমার মাতৃভাষা। এবার মায়ের কথাই যখন উঠল; তখন বলি, মা আসলে বাঙালি হলেও বেড়ে উঠেছিলেন কিন্তু বিহারে। তাঁর মূল পড়াশোনা তাই হিন্দীতেই। সেই সূত্রে তাঁর কাছেই আমার হিন্দী শেখা ছোটবেলায়। তাও সে ভাষার উপর চর্চার অভাবে এখন বেশ খানিকটা ধুলো পড়েছে আমার। আর বাকি রইল ইংলিশ — ইংরেজদের ভারতবর্ষের উপর দুশো বছরের রাজত্বের ফলে সেই ভাষাটা বলতে গেলে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রেই মিশে গেছে এখন। স্কুল কলেজ অফিস জীবনে সব জায়গায় তাই ওই চত্বরেই হাঁটতে হয় এখন বারবার। ব্যস, এ ক'টা ভাষাই আমার সে অর্থে জানা। তাই অনুবাদ সাহিত্য চর্চা যদি না করতাম আমি থেকে থেকেই, ভেবে দেখেছো কি দশা হতো আমার! বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে ক্রমাগত যে জোয়ার ভাটা চলছে; তার কতখানিই বা রপ্ত করতে পারতাম আমি! গোটা পৃথিবী বাদ দাও, পুরো ভারতবর্ষেই এতোগুলো ভাষা – তাদের থেকেই বা জানতাম শিখতাম কিভাবে! হ্যাঁ মানছি, সমগ্র সাহিত্যকে ধরার চেষ্টা করাটাই বৃথা... সে যে আসলে সমুদ্র। কিন্তু সাঁতারটুকু তো এখন শিখতে পেরেছি অন্তত অনুবাদের সৌজন্যে! জলে চিৎ হয়ে ভেসে তো থাকতে পারব কিছুক্ষণের জন্য – সেটাই বা কি কম পাওয়া! এটুকুও না হলে তো কুয়োর ব্যাঙ হয়েই থেকে যেতে হতো সারা জীবন!

হ্যান – না না, পারিজাত, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। সে তো ঠিকই। আমি যেমন কোরিয়ান। আমাদের এখানে তো 'হাঙ্গুগেও' মানে তোমরা যাকে বলো কোরিয়ান, একমাত্র সে ভাষারই সবচেয়ে বেশি প্রচলন। এখনকার ছেলে মেয়েরা ইংলিশটা লিখতে পড়তে হয়তো শেখে আন্তর্জাতিক কাজকর্মের প্রয়োজনে... কিন্তু ব্যস, ওটুকুই। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা শেখা এখানে জরুরি নয় একেবারেই। তাই এই সীমাবদ্ধতা আমার চেয়ে ভালো কেউ বোঝে বলে মনে হয় না। যখন কলেজে উঠে বিশ্বসাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম, তখন মনে হল এইবারছুঁতে পারব আকাশটা। দমবন্ধ হয়ে আসবেনা আর কখনওই। সেই হিসেবে বলতে গেলে এই গোটা পৃথিবীর দরজা অনুবাদ সাহিত্যই খুলে দিয়েছে আমার সামনেও প্রথমবার। চিনেছি শেক্সপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভিক্টর হুগো, ভার্জিনিয়া উলফ্, সিলভিয়া প্লাথ থেকে শুরু করে হারুকি মুরাকামি, শার্লট উড, ঝুম্পা লাহিড়ী, ইয়ুন লি সব্বাইকে। তোমার লেখাদের সাথেও তো আমার অনুবাদের সূত্রেই পরিচয়!

আমি – এইরে, এত বড় বড় লোকেদের সাথে আমার নামটা আর বসিও না হ্যান। কেমন কেমন লাগে!

হ্যান – কেন নয়? তুমিও তো লেখালেখিই করো। কতগুলো বই তোমার প্রকাশিত। নিজের ভাষাকে নিজের মতো করে প্রতিদিন উদযাপন করছো তুমিও আমারই মতো। তাহলে তোমার নাম আমার পড়া লেখকদের সঙ্গে নিতে বাধা কোথায়? তুমি নাম করোনি বলে? আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুবাদিত হয়ে বিশ্ব সাহিত্যের দরজায় তোমার লেখারা পৌঁছয়নি বলে?

আমি – সে তো একটা বড় কারণ বটেই। তাছাড়া, লেখালেখির সূত্রে সেভাবে বাংলাতেও আমাকে কেউ চেনে না। সবখানেই হেরে ভূত আমি। আর খ্যাতনামা না হলে কোন্ বড় প্রকাশনা সংস্থা চাইবে বলোতো হ্যান আমার লেখাদের অনুবাদ করে

পৌঁছে দিতে বিশ্বের দরবারে?



হ্যান – আর আমি ঠিক এটাই বলার চেষ্টা করছি প্রথম থেকে। লেখালেখিতে কোনও প্রকারভেদ হয় না। যেটাই হয়, সেটা হল সাহিত্য; ইংলিশে যাকে বলে Literature। সেটাই শেষ কথা। সাহিত্যে যেমন নামী অনামী হয় না; তেমনই দেশ, কাল, লিঙ্গ, প্রকার, ভাষা দিয়েও তাদের বিভেদ সম্ভব নয়। একজন পাঠকের কাছে যে কোনও বই, তা সে গল্পের হোক, কবিতার হোক, জীবনধর্মী হোক বা প্রবন্ধের; তারা আসলে একটা পোর্টাল বা দরজার কাজ করে – যেটা খুললেই খোঁজ মেলে আরও অনেক অনেক জীবনের, বয়ানের, বেঁচে থাকার। ঠিক যেমন কোনও জীবনই বড় বা ছোট হয় না, তেমনই তাদের গল্পও – সে যে ভাষাতেই হোক না কেন, যতটা খ্যাতিই পেয়ে থাক না কেন; তার সবটাই সাহিত্য। হ্যাঁ, যদি ভাগ করতেই হয় অবশ্য কোনও পরিমাপ দিয়ে, তবে তা হবে গুণগত মানে; লেখা ভালো না খারাপ সেই বিচারে।

একজন পাঠকের কাছে যে কোনও বই... আসলে একটা পোর্টাল বা দরজার কাজ করে - যেটা খুললেই খোঁজ মেলে আরও অনেক অনেক জীবনের।



আমি – খারাপ বলাতে মনে পড়ল। আমার মা ইংলিশে সেরকম সড়গড় ছিল না অথচ পড়তে ভালোবাসতেন বলে প্রতিবার বইমেলায় গেলে দেশ বিদেশের অনেক বইয়ের বাংলা বা হিন্দি অনুবাদ সংগ্রহ করতেন। যেমন একবার কিনেছিলেন ইলিয়াড, ওডিসি এসবের ক্লাসিক সমগ্র। তাতে গল্পগুলো জেনেছিলাম হয়তো কিন্তু ক্লাসিক্সের ভাষার রস একফোঁটাও পাইনি। আরেকটা মনে আছে, জেমস্ হেডলি চেজ রহস্য রোমাঞ্চ সমগ্র। বাব্বাহ, কি বাজে কি বাজে! ভাবানুবাদের বদলে বোধহয় প্রতিটা শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন অনুবাদক। পড়ব কি, চোখে দেখা যাচ্ছিল না। তখনই বুঝেছিলাম, অনুবাদকের অবদান একটা সাহিত্যের মানের উপর কতখানি প্রভাব ফেলতে পারে। তুমি মুরাকামির নাম তো বললেই আমি আরেকটা নাম এখানে বলব — ইয়াং শুয়াং জি। ওনার লেখা 'তাইওয়ান ট্রাভেলগ'এই বছর আন্তর্জাতিক বুকার প্রাইজ পেলো। পড়ে এখনও ঘোরের মধ্যে আছি। তাই বলছিলাম, অনুবাদ সাহিত্য একটা নির্দিষ্ট বা বিশেষ স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারাই – সবকিছুর সাথে তাকে গোলালে চলবে না।

হ্যান – ঠিক, এটা একটা অসুবিধে তো বটেই। অনুবাদ সাহিত্য আসলে দিনশেষে যৌথ প্রকল্প – লেখক সেখানে যতটা ভূমিকা পালন করে, সেই লেখার মান ধরে রাখার ক্ষেত্রে একজন ভালো অনুবাদকের অবদানও ভোলার নয়। আসলে দিনশেষে লেখালেখির পথ বেশ কঠিন একখানা পেশা তো – ঠিকঠাক উপার্জন না হলে অনেকেই তাই এই রাস্তায় পা বাড়াতে চাইবে না। ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জাপানিজ — এরকম কয়েকটা ভাষা যারা অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে রীতিমতো চর্চা করে প্রতিদিন, তাদেরকে বাদ দিলে প্রকৃত ভালো মানের অনুবাদক যে লেখার মানকে অপরিবর্তিত রেখে তাকে পৌঁছে দেবে বিশ্বের দরবারে, পাওয়া মুশকিল। আমাদের লেখকদের অনেক সময়েই তো উপায় থাকে না। যেমন তুমি বা আমি — পয়সা রোজগার না হলেও আমাদের লিখতে হবেই কেবলমাত্র সাহিত্যের আবদারে, মনের জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার দায়ে। কিন্তু ভালো উপার্জনের প্রতিশ্রুতি না থাকলে অনুবাদক হওয়ার টানটা তো পড়ে যায়ই কিছুটা। অস্বীকার করে লাভ নেই

একদম। এখানে সে হিসেবে দেখত গেলে AI বা Artificial Intelligence আমায় খুব সাহায্য করছে আজকাল। তোমার বাংলায় লেখা গল্প, কবিতা সব তো আমি তার সাহায্যেই কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে পড়ি। প্রথম প্রথম ঠোক্কর খেলেও এখন কিন্তু বেশ সড়গড় হয়ে উঠছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। তার কাছে আরও একটা সুবিধে আছে; সে কিন্তু নামী অনামীর কোনও বিভেদ করেনা। কিংবা কোন ভাষায় অনুবাদ করলে বেশি লাভ; সে খেয়ালও সে করে না। হ্যাঁ, পৃথিবীর সব ভাষা যদি অনুবাদ না করেই পড়তে পারতাম, তাহলে হয়তো যে কোনও লেখার প্রকৃত নির্যাস নেওয়া সহজ হত, কিন্তু তা যেহেতু হওয়ার নয়, তাই এই একটি ক্ষেত্রে AI এখন আমার বিশ্বের দরবারের জানালা। যেখানে সাহিত্যই মূল রসদ; কে, কোথায়, কবে বসে তা লিখে গেছে — সেটা আর বড় কথা নয়! কি, বুঝলে কিছু পারিজাত?

আমি – বুঝলাম বইকি হ্যান। সত্যি বলতে কি, প্রযুক্তির হাত ধরে তোমার সব কথা অনুবাদ হল বলেই তো দিনশেষে সাহিত্যের মতোই এ যাত্রায় টিকে গেল আমাদের এই অসমভাষী বন্ধুতাও! ভালো থেকো। পরে কথা হবে আবার!

হ্যান – ভালো থেকো তুমিও। সাহিত্যে থেকো। ভেবে দেখলে আবার প্রতিটি লেখাই তো অনুবাদ – নিজের মনের ভাবনার ভাষাকে যত্নে মুড়ে অনুবাদ করতে হয় খাতার পাতায় লেখার ভাষায়... তাই আজ কিন্তু এই তর্কে বিতর্কে তুমি বা আমি কেউই জিতলাম না। জিতল সাহিত্য; জিতে গেল সবার সঙ্গে সংযোগস্থাপনের সকল পন্থা!

(না। এই কথোপকথনটি নেহাৎই কাল্পনিক। এর কোথাও কোনও সত্যতা আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। তবু অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতাকে মর্মে বুঝতে এটুকু ছলনার আশ্রয় আমাকে নিতেই হতো। সাধারণ এই প্রাবন্ধিক আলোচনাকে কল্পনার মিশেলে তুলে ধরাও যে এক প্রকার নিজের মনকে অনুবাদ করে জনসমক্ষে রাখাই... এই ভাবকে নয়তো নিজের জীবনের আঙ্গিকে টের পেতাম আর কি উপায়ে!)

অনুবাদে বাদ যায়, তর্জমাতে হয় জমা



সৌমিক বসু



অনুবাদ অর্থাৎ Translation শব্দটির উৎস ল্যাটিন শব্দ translatio, যেখানে trans মানে অতিক্রম করা এবংlatio মানে বহন করা। অর্থাৎ অনুবাদ সাহিত্য হলো সেই জিনিষ যা ভাষার সীমানা অতিক্রম করে পাঠকের মনে দাগ রেখে যায় অর্থাৎ তাঁর স্মৃতিতে বহিত হতে থাকে। অনুবাদ সাহিত্য যে কোনো ভাষার সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। একদল পাঠকের মতে অনুবাদ সাহিত্য না পড়ে মূল ভাষাতে পড়া শ্রেয়, কারণ কিছু ক্ষেত্রে অনুবাদক মূল ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম হন। আবার অন্য এক অংশের মতে মূল ভাষার লেখা পড়ে রস আস্বাদনের সুযোগ না থাকলে প্রাঞ্জল অনুবাদের মাধ্যমে সেই সাহিত্যরস গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হওয়া যায়। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে একসময় ছিল স্বর্ণযুগ, বাংলা ভাষার বহু দিকপাল লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবিরা বিদেশী সাহিত্য থেকে বাংলাতে রূপান্তরিত করার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমরা সৌভাগ্যবান যে আমাদের ছেলেবেলাতে আমরা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের কিছু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।



আমাদের মধ্যে যারা মূলত আট ও নয়ের দশকে স্কুলে পড়াশুনা করেছে, এবং যাদের পড়াশুনা মূলত বাংলায়, তাঁদের মানসিক গঠনের পিছনে, বেড়ে ওঠার পিছনে অনুবাদ সাহিত্যের অবশ্যই শুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে । আমাদের বাল্যকাল জুড়ে দেশজ সাহিত্যের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের অনুবাদ সাহিত্য রমরমিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে। সেইসব গল্প, উপন্যাস, কমিক্স এখনো স্মৃতির অনেকটা জুড়ে আছে। প্রথমেই মনে পড়ে দেব সাহিত্য কুটিরের অনুবাদ সিরিজ, যা মূলত "দেব সাহিত্য কুটিরের ছোটো বই" নামে পরিচিত ছিল এবং বিভিন্ন স্কুলের লাইব্রেরিগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে পাওয়া যেতো। "কমেডি অফ শেক্সপীয়ার", "ট্র্যাজেডি অফ শেক্সপীয়ার", শেক্সপীয়ার এর কিছু বিখ্যাত নাটক যেমন "মার্চেন্ট অফ ভেনিস", "ওথেলো", "রোমিও জুলিয়েট" ইত্যাদির ছোটদের উপযোগী বাংলা অনুবাদ সেই সময় পাওয়া যেতো যেগুলির প্রচ্ছদ অলংকরণ করতেন নারায়ণ দেবনাথ। এই বিপুল কর্মকান্ডের জন্যে দেব সাহিত্য কুটিরের কর্ণধার শ্রী সুধীন্দ্রনাথ রাহা মহাশয়ের অবশ্যই একটা বিরাট ধন্যবাদ প্রাপ্য। এর পাশে ছিল "গালিভার ট্রাভেলস", "রবিনসন ক্রুসো", "ট্রেজার আইল্যান্ড" ইত্যাদি কালজয়ী কিশোর ক্লাসিক্স, "গ্রিমভাইদের রূপকথা" যা জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজি হয়ে বাংলায় অনূদিত হোতো, আর ছিল "সিন্ধবাদ" নামের পারস্যের এক নাবিকের গল্প যা মূলত আরব্য রজনীর অংশ যার মূল উৎস ভাষা ছিল আরবী। এইসব গদ্য, সাহিত্য আমাদের জীবনের পরতে পরতে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলো এদের কখনো অনুবাদ সাহিত্য বা বহিরাগত সংস্কৃতির অংশ মনে হয়নি।

আরো এক শ্রেণীর গল্প, সাহিত্যের কথা না বললেই নয়। ছোটবেলায় দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলের বাইরে লাল শালুতে মোড়া বামপন্থীদের বইয়ের একটি স্টল থাকতো। সেখানে চীন এবং রাশিয়া থেকে আনা বিভিন্ন বই পাওয়া যেতো। রাশিয়ান থেকে বাংলায় অনূদিত সেইসব বই ছিলো যেমন ঝকঝকে দেখতে, দামী মোটা কাগজে ছাপা, সুন্দর হার্ডকভারে মোড়া আর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ছিলো অন্যদের থেকে অনেকটা এগিয়ে। ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "সোভিয়েত দেশ","ইউক্রেনীয় উপকথা", "রুশদেশের উপকথা", এছাড়া লিও তলস্তয়, আলেকজান্ডার পুশকিন, ম্যাক্সিম গোর্কি, নিকোলাই গোগোলের মতোন বিখ্যাত রুশ কথা সাহিত্যিকদের অনূদিত গল্প, সাহিত্য পড়তে পড়তে কখন যে বরফে ঢাকা একটা দূরের দেশকে, তার মানুষজনকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম সেকথা নিজেও জানি না। প্রগতি প্রকাশন, রাদুগা, ভস্তক প্রকাশনা ইত্যাদি একসময় বাঙালির পরিচিত নাম হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে এইসব সংস্থা বন্ধ হয়ে যায়, আর সেইসব বই ধীরে ধীরে জীর্ণ আর হলুদ হয়ে একরাশ স্মৃতি আর ধুলোর আস্তরণের নিচে চাপা পড়ে যায়।

তার সাথে আমাদের ছেলেবেলা আলো করে ছিলো অজস্র কমিকসের চরিত্ররা, যেসব কমিক্স মূলত ইংরেজি বা অন্য ইউরোপীয় ভাষা থেকে অনূদিত ছিল। ইন্দ্রজাল কমিক্স বা আনন্দমেলাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এসব কমিক্স অনায়াসে নারায়ণ দেবনাথের "হাঁদা ভোঁদা","নন্টে ফন্টে" বা "বাঁটুল দি গ্রেট " এর পাশে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছিলো। মজার

কথা হলো, আমরা একটা বয়স পর্যন্ত এই অনূদিত সংস্করণগুলোকেই একমাত্র বলে জানতাম। আরো একটু বড়ো হয়ে জানতে পেরেছিলাম টিনটিনের লেখক আসলে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নন, তাঁর নাম রেমি জর্জ বা সংক্ষেপে হার্জে। আবার অরণ্যদেব বা ম্যানড্রেকের আসল স্রষ্টা যে লি ফক নামের একজন মার্কিন কার্টুনিস্ট এই ভুল ভাঙতে আমাদের একটু সময় লেগেছিলো। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসেনি, আজও আমার কাছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অনূদিত বাংলা টিনটিন, ইংরেজিতে প্রকাশিত টিনটিনের থেকে অনেক বেশি উপভোগ্য।

আরো একটু বড়ো হতে বিশ্বসাহিত্যের সাথে পরিচয়। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় লেখা গল্প ও উপন্যাসের নিরংকুশ ভোটব্যাংকে ভাগ বসলো তুলি কলম থেকে প্রকাশিত "তলস্তয় রচনাবলী", "ভিক্টর হুগো রচনাবলী", "ও হেনরি সমগ্র", "শার্লক হোমস অমনিবাস", "আগাথা ক্রিস্টি অমনিবাস" ইত্যাদি অনুবাদ সাহিত্য। বাংলা এবংঅন্য ভাষার এই মিলে মিশে চলা আমার পাঠকসত্ত্বাকে সমৃদ্ধ করেছে বারবার।

আসলে এতোক্ষণ ধরে যে শিবরাত্রির সলতে পাকাচ্ছিলাম, তা এই অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে কিছু কথা আলোচনা করবো বলে। একথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই, অনুবাদ সাহিত্য সেই বহুযুগ আগে বিশ্বায়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। আজ আমরা যতই "গ্লোবাল সিটিজেন" বলে গলা ফাটাই না কেন, অনুবাদ সাহিত্য বহুদিন ধরে অন্য দেশ বা রাজ্যের সংস্কৃতি, মনন, জীবনধারার সাথে পরিচিতি করানোর, যোগসূত্র বাঁধার কাজটা নিরন্তর করে চলেছে। বাংলা উপন্যাসের জন্ম ইউরোপীয় উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্কট, ডিকেন্স, ও ফরাসি ঔপন্যাসিকদের পড়েই বাংলা উপন্যাসের ধাঁচ তৈরি করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ্রিক ও শেক্সপিয়রীয় নাটক অনুশীলন করে বাংলা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেট আনেন। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ ও ইউরোপীয় নারীবাদী চিন্তা — সবই অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। রামমোহন রায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, সকলেই বিশ্বসাহিত্য পড়ে তাঁদের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে চেখভ ও মপাসাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট, আবার রবীন্দ্রনাথ শুধু গ্রহণ করেননি, দিয়েছেনও। গীতাঞ্জলি ইংরেজিতে অনূদিত হওয়ার পরে তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান — বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এইভাবে দুই সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধনের মাধ্যমে অনুবাদ সাহিত্য আসলে বহুত্ববাদের বীজ বপন করে পাঠকের মনে, উগ্র স্বাদেশিকতা এবংএকত্ববাদকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে যা হয়ে ওঠে মোক্ষম এক হাতিয়ার।
এবার অনুবাদ সাহিত্যের গুনগত মান নিয়ে কিছু কথা। আমার মনে এক বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে, যে কোনো অনুবাদ সাহিত্যের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে বিষয় নির্বাচন এবংঅনুবাদকের ভাষার উপর দক্ষতা এবং মুন্সিয়ানার উপর। কোন কোন দিকপাল লেখক, সাহিত্যিকেরা সেই যুগে বাংলা ভাষায় অনুবাদকের কাজ করে গিয়েছেন একথা ভাবতে অবাক লাগে। এমন বহু উদাহরণ আছে যেখানে বিদেশী সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের ফলে এক স্বতন্ত্র শিল্পকীর্তির সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদকের জ্ঞানগর্ভ বুলি এবংগুরুচন্ডালি দোষে অনুবাদিত রচনা এমন উচ্চমার্গীয় হয়েছে যে পাঠক দুইপাতা পড়বার পরে ভয় পেয়ে বই ফেলে অন্যদিকে দৌড় মেরেছে। আসলে অনুবাদকের ভূমিকা এখানে একজন মধ্যস্থতাকারীর, তাঁকে দুই ভাষার মধ্যে, দুই সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটা নিরন্তর চালিয়ে যেতে হয়।

এক সময় বাংলা ভাষার বহু মহীরুহ এই অনুবাদ সাহিত্যের শাখাকে তাঁদের মতোন করে মহিমামণ্ডিত করেছেন। ভাবতে অবাক লাগে, মহাশ্বেতা দেবীর মতোন সিরিয়াস লেখিকার অনূদিত "জিম করবেট অমনিবাস", "টারজান সমগ্র" আমরা পড়েছি। "শার্লক হোমস" এবং"আগাথা ক্রিস্টি"র গোয়েন্দা গল্প, উপন্যাসগুলি এবংবহু বিদেশী কল্পবিজ্ঞান কাহিনী অপূর্ব মুন্সিয়ানার সাথে পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন শ্রী অদ্রীশ বর্ধন। প্রেমেন্দ্র মিত্র অনুবাদ করেছেন আলমেয়ের কামু-র "দি আউটসাইডার", সুভাষ মুখোপাধ্যায় করেছিলেন পাবলো নেরুদা-র কবিতার অনুবাদ। বুদ্ধদেব বসু অনূদিত লুই পাস্তারনাকের “ডঃ জিভাগো”র কথা আজও পাঠকের মুখে ফেরে। তিরিশের দশকের পঞ্চকবি (অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) ইউরোপীয় বা বিদেশী ভাবধারার কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তার ফলে তাঁদের কবিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউরোপীয় প্রভাব জন্মায়। ওঁনাদের প্রায় সকলেই হয় বিভিন্ন ধরণের অনুবাদের কাজে সরাসরি যুক্ত ছিলেন অথবা ইউরোপীয় ভাবধারার কবিতা পাঠক হিসাবে গ্রহণ করে তার সংশ্লেষ বাংলা কবিতায়

ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, সেই সময় থেকেই বাংলা আধুনিক কবিতায় প্রাণসঞ্চার হয়, রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নতুন ভাবনা সঞ্চারের জন্যেই যা সেই সময় হয়তো খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

তবে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের জগতে যিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম", তিনি হলেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কেবলমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্য নয়, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবংআরব দেশের বহু সাহিত্য রচনা বাঙালি ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদ সাহিত্যে অবদানের জন্যেই তিনি "সাহিত্য একাডেমী অনুবাদ" পুরস্কারে ভূষিত হন। শোনা যায় কবি শঙ্খ ঘোষ একবার বলেছিলেন, "মানববাবু যে লেখকদের লেখা অনুবাদ করেন, তাঁরা আসলে কোথাও নেই। কিন্তু কয়েক বছর পরে দেখা যায় তাঁরাই নোবেল পাচ্ছেন। " একথা ঠিক , মানববাবু যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কুইজ এর "One Hundred Years of Solitude" পড়াতেন, সেটা ১৯৭১ সাল। মার্কুইজকে তখন কেউ চেনে না, আর তার পাক্কা ১১ বছর পরে ১৯৮২ তে তাঁর নোবেল লাভ। একথা বলাই যায়, বাংলা সাহিত্যে পরাবাস্তবতা বা "magic realism" এর প্রভাব শুরু হয় মানববাবুর অনূদিত লাতিন সাহিত্যের হাত ধরে। শুধু মার্কেজ (কলম্বিয়া)নয়, মানববাবুর অনুবাদ তালিকায় রয়েছেন হোরহে লুই বোর্হেস(আর্জেন্টিনা), পাবলো নেরুদা(চিলি), ছাড়াও মেক্সিকো, ব্রাজিল, পেরুর বহু কবি, সাহিত্যিক।

মানবেন্দ্রবাবুর প্রসঙ্গ শেষ করবো তাঁর অনুবাদ সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে। অনুবাদ ও তর্জমার মধ্যে বোঝাতে তিনি বলেছিলেন, "অনুবাদ করতে গেলে তো অদল-বদল একটু আধটু হয়ই। হুবহু এক রকমভাবে সেটা হয় না। কিন্তু আমাকে ভাবতে হবে যে এটা আমি কাদের জন্যে করেছি, তাঁরা কি রকমভাবে পড়ে, কি জানে! তখন আমার মনে হয়েছিল তর্জমার কথাটা, তাতে খানিকটা স্বাধীনতা নেওয়া যায় যাতে পাঠক পড়তে পারে। আমার কাছে তর্জমা শব্দটা বেশি পছন্দ। "অনুবাদ" যেন "বাদ" দেওয়াটা বড়ো করে দেখে, "তর্জমা" তে জমা পড়ে।

"অনুবাদ" যেন "বাদ" দেওয়াটা বড়ো করে দেখে, "তর্জমা"-তে জমা পড়ে।

সবশেষে অনুবাদ সংক্রান্ত দুটি আক্ষেপের কথা, মতামত নিতান্তই ব্যক্তিগত। এক, আমার ধারণা যে অনুপাতে বিশ্বসাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে, সেই তুলনায় ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদ খুবই কম হয়েছে। বহুক্ষেত্রে বেশ মাঝারি মানের ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের (Indian English)অনুবাদ নিয়ে হইচই হয়েছে, কিন্তু অনেক বেশি গুনমানসম্পন্ন তামিল বা কানাড়া ভাষার গল্প বা উপন্যাস লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গিয়েছে। এখানে অবশ্যই প্রকাশনা সংস্থা, বিপণন ইত্যাদি বিষয়ের বড়ো ভূমিকা থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, অন্য ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ যতো হয়েছে, সেই অনুপাতে গুণমান অক্ষুন্ন রেখে বাংলা থেকে বিশ্বের অন্য ভাষায় যথেষ্ট অনুবাদ হলে হয়তো বাংলা সাহিত্যে আরো গুটি কয়েক নোবেল আসতো। বিভুতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দোপাধ্যায় বা জীবনানন্দ দাশের লেখা পৃথিবীর আরো বেশি সংখ্যক অন্য ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌছানো গেলো না এ কোথাও গিয়ে আমাদের বাঙালি জাতির সামগ্রিক ব্যর্থতা।



পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবনবোধকে নিজের ভাষায় আত্মস্থকরণের প্রক্রিয়ায় অনুবাদ সাহিত্য এক বিরাট ভূমিকা পালন করে এসেছে। শুধুমাত্র অনুবাদ সাহিত্যের জন্যেই পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক অঞ্চলের পাঠক পারেন জাপানি সাহিত্যিক হারুকি মুরাকামি, বা স্কান্ডেনেভিয়ান লেখক জো নেসবো র সাম্প্রতিক লেখার স্বাদ নিতে, তার রস আস্বাদন করতে। জ্ঞানের মতোন অমূল্য সম্পদ যুদ্ধ নিগ্রহ না বাঁধিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশের মানুষ শুষে নিতে পারে শুধুমাত্র অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই "পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার " । অনুবাদ সাহিত্য আসলে সেই খোলা দরজা যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বসাহিত্য এবং ভারতীয় অন্য লোকসাহিত্যের মুক্ত বাতাস খেলে যায়

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উঠোনে। অনূদিত সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের জন্য অপরিহার্য — এটি কেবল বাইরের প্রভাব নয়, বরং বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার মূল চালিকাশক্তি।

'A poem can not be translated; it can only be re-lived in a different atmosphere' – Rabindranath Tagore

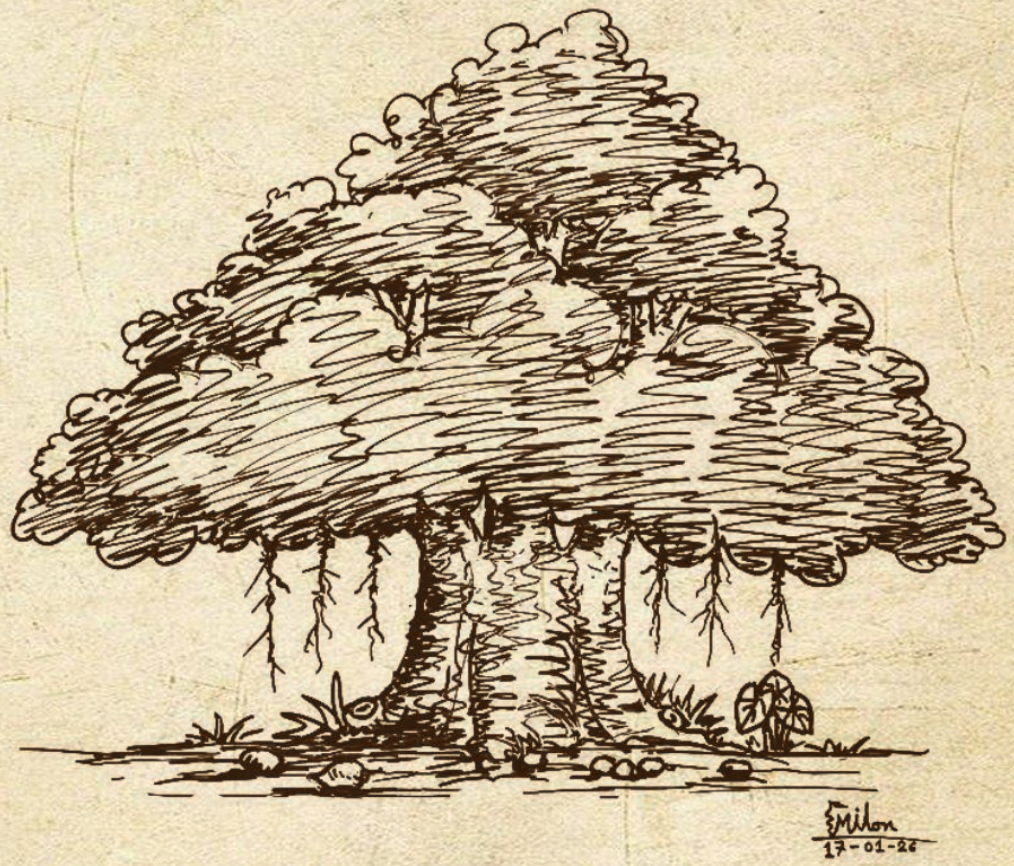
---

সাহিত্যের উৎকর্ষে অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা

লেখক



শাশ্বতী বসু



নৈমিষারণ্য । কুলপতি শৌনকের আশ্রম । সেখানে বারো বছর ধরে যজ্ঞ চলছে । ঋষিরা যজ্ঞ ক্রিয়ার দৈনন্দিন একঘেয়েমিতে হাঁপিয়ে উঠছেন । অবসরও তাদের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে । এমন সময় সেখানে উপস্থিত হয়েছেন কথক ঠাকুর উগ্রশ্রবা । ঋষিরা হৈ হৈ করে উঠলেন । হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন । কারণ এখন উগ্রশ্রবা তাদের গল্প বলবেন । সে গল্প এমন যে শুনে লোম খাড়া হয়ে ওঠে । এমনই কথা চালু রয়েছে তাঁর পিতা লোমহর্ষ মুনির এবং তাঁরও গল্প বলার নৈপুণ্যের । ঋষিরা তাই আনন্দে সবাই মিলে একেবারে ঘিরে ধরলেন উগ্রশ্রবাকে । লক্ষণীয় এখানে যে বৈদিক মন্ত্র , যাগ যজ্ঞ , সামগান ইত্যাদিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ঋষিরাও গল্প শুনতে ভালবাসতেন । বিশেষ করে মহাভারতের গল্প যা উগ্রশ্রবা এখন বলতে যাচ্ছেন (কথা অমৃতসমান ঃ নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী) ।

সেই ঐতিহ্য এখনও বহমান । মানুষ গল্প শুনতে ভালবাসে । কাহিনি শুনতে ভালবাসে । নিজের দেশের তো বটেই , ভিন্ন দেশের , ভিন্ন সংস্কৃতির , ভিন্ন ইতিহাসের, ভিন্ন রাজনীতির প্রতিও তাঁর সমান আগ্রহ । বিশাল এবংবহু বিচিত্র ধরনের ভাষাভাষী মানুষের দেশ এই পৃথিবী । তাদের গল্প জানতে হলে তো তাদের সেই ভাষা আমাদের আয়ত্ব করতে হবে । কিন্তু কজনের পক্ষে তা সম্ভব ? এখনও বিশ্বে একটিমাত্র সর্বজনবোধ্য কোন ভাষা তো তৈরি হয় নি ! সুতরাংঅনুবাদের প্রয়োজন এখানেই । পৃথিবীর বৃহত্তর সাহিত্যের সাথে সংযুক্ত হবার জন্য এবং নিজের সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার জন্য অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই (robindra-rachanabali.nltr.org) । অনূদিত বই শুধু গল্পতেই থেমে থাকে না । এ বই অন্যভাষার পাঠক তৈরি করে , বিশ্ব সাহিত্যের চিরকালীন ভাবনা অন্য সাহিত্য ভাষার পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করে । নতুন সাহিত্যের সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় , নতুন লেখক সৃষ্টি হয় । মৌলিক ভাষার বইটিকে নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করার প্রয়াসে নিজের ভাষার শব্দ ভাণ্ডার ধনী হয় ।



শৈশবের দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ননি ভৌমিকের ঝুলি থেকে বেরিয়ে 'আজব দেশে অমলার' আজগুবি মজার কাণ্ড শেষে প্রথম যে অনুবাদের গল্প হাতে এসে পড়েছিল সেই অষ্টম শ্রেনীতে সেটা হল ভিক্টর হুগোর একটি গল্প Huncback of Notredame । সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি পড়েই চলছে । তন্ময় হয়ে পড়ছিলাম । এরই মধ্যে ছোট মামার প্রবেশ । বইটি কেড়ে নিয়ে বললেন – ও এই তক্র শরবত পান করা হচ্ছে এখনই ? অবাক হয়ে তাকাতে তিনি বইটি নিয়ে প্রস্থান করলেন । কি হল ? তক্র মানে কী কে জানে তবে নিষিদ্ধ কিছু হবে হয়ত । যা আমার এই বয়সে পড়া উচিৎ নয় । বইটি অবশ্য পরে উদ্ধার করেছিলাম এবং গোগ্রাসে গিলেছিলাম । সম্যক ধারনা ছিল না সেই ফ্রান্স দেশটা কেমন সেটা নিয়ে এবং বোধের স্বচ্ছতাও নিঃসন্দেহে অনুপস্থিত – তবে Esmeralda আর Quasimodo র অনুভূতিতে অংশ গ্রহণ করতে অসুবিধে হয় নি । । বুক ভেঙ্গে গেছে শেষ পৃষ্ঠায় তাদের পরিণতিতে । কারণ ওদের আমার অচেনা লাগে নি । ওদের তো বিশেষ করে Quasimodo কে তো কালীবাড়ির সামনে বসে ভিক্ষে করতে দেখেছি - এমনই মনে হয়েছে । এমনই অসাধারণ এই গল্পের আবেদন । এমনই অসাধারণ এর চরিত্র চিত্রণ । গল্পটা সেই বালিকা বয়সেও বহুজনকে পড়িয়েছি ।

পরিণত বয়সে যখন সজ্ঞানে অনুবাদ এর মধ্য দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের স্বাদ পেতে শুরু করলাম তখন আবার ভিক্টর হুগো পড়েছি তখন বুঝতে পেরেছি এই যে সম্পূর্ণ মধ্য যুগের প্যারিসে ১৪৮২ সালের ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি , কুসংস্কার , ধর্মের অনুশাসনের নামে মানুষের উপর নিষ্ঠুরতা , রাজনীতির বঞ্চনা , নারী দেহ লোলুপতা এ সমস্ত কিছুর বাঁধা পেরিয়ে চিরকালের মানুষই প্রধান দুই চরিত্রের চরিত্রায়নে ফুটে উঠেছে, তাই তাকে মনে হয়েছে বাংলার এক অর্বাচীন পাঠিকার কাছের মানুষ । এ বইটি বিশ্ব সাহিত্যের এক অমুল্য কালজয়ী সম্পদ । স্থান কাল পাত্রর বাধা ছাড়িয়ে মূলত সমস্ত মানবসন্তানই যে সুখ দুঃখ ব্যথা লাঞ্ছনা অপমান নিয়ে সেই অমৃতেরই সন্তান - এই চিরকালীন বার্তাই বইটি বহন করে । অনুবাদ সাহিত্য বিশ্ব মানবকে এক সূত্রে গেঁথে নেয় । পাঠককে করে তোলে সংবেদনশীল ।

আরও একটি অনূদিত বই যা আমার জীবনে এক আশ্চর্য জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করেছিল সে হচ্ছে George Orwell এর



লেখা Animal Farm (1945)। এ গল্প পৃথিবীর এক নির্জলা সত্যকে অর্থাৎ 'power corrupts' এই সত্যকে রূপকের মোড়কে পরিবেশন করেছে। যেটি বাংলা প্রবাদ ভাষায় – "যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ"। এই গল্পে এক জমিদার বাড়ির খামারের পশুরা জমিদারের অত্যাচার ও শোষণে ক্ষিপ্ত হয়ে একদিন সহসা জমিদারকে আক্রমন করে ও উৎখাত করে খামার দখল করে নেয়। তাঁরা নিজেরাই সমতার নীতিতে নিজের শাসনব্যাবস্থা চালু করে। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা যায় একদল পশু যারা শাসন ব্যাবস্থার কর্তা তাঁরা সাধারণ পশুদের ওপর জমিদারের মতই অত্যাচার ও শোষণ শুরু করেছে সমতার নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে। সুতরাং যে দলই ক্ষমতায় যাবে অনতিবিলম্ব পরে সেই ক্ষমতালোভী অত্যাচারী শাসকে রূপান্তরিত হবে। এই গল্পটি পড়ে , তখনকার পশ্চিম বঙ্গের দুর্নীতিগ্রস্থ বামফ্রন্টের সাম্যের প্রতিশ্রুতিতে তৈরি শাসনব্যাবস্থা কী ভাবে অসাম্য ও শোষণ রাজে পরিণত হয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ল তারই প্রতিচ্ছবি দেখেছিলাম। তারপরে যে রাজনৈতিক দল এলো পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তারাও দেড় শতক রাজত্ব করার পর হুবহু সেই বিপ্লবী পশুদের মতই দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার শুরু করে। অথচ জর্জ অরওয়েল এই বইটি লিখেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরে স্ত্যালিনের রাজত্বকালের পটভূমিকায়। কিন্তু এ সাহিত্য চিরকালের সাহিত্য হয়ে দেশ ও মহাদেশের গণ্ডি পার হয়ে পৃথিবীর সমস্ত শাসক নিপীড়িত জনসাধারণকে এক পরিবারের সদস্য করে দিয়েছে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত ক'রে এই বই গুলোর শাশ্বত বার্তা পাঠককে যেমন ঋদ্ধ করে তেমনি লেখককেও উদ্ভুদ্ধ করে এই ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে অন্য লেখা রচনায়।

মনে পড়ছে আমাদের দেশের অন্ধ্র প্রদেশের আইন জীবি , লেখিকা ও নারীবাদী বানু মুস্তাকের ছোট গল্পের বই "Heart Lamp" এর কথা। যেখানে মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধে পিতৃতান্ত্রিক লিঙ্গসাম্য বিরোধী সমাজব্যাবস্থা নারীসমাজকে কী ভাবে পরাধীনতার শিকলে আটকে রেখেছে এটা যেমন দেখানো হয়েছে তেমনভাবে পরিশেষে নারীসমাজের প্রতিবাদে সোচ্চার হবার ঘটনাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বইটি International Booker Prize পেয়েছে সম্প্রতি (2024)। পুরুষ তন্ত্রের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত পৃথিবীর সমস্ত মহিলাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই কাহিনিতে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন , তাদের নিজেদের জীবন দেখতে পাবেন। বিশ্বকে এক সূত্রে গেঁথেছেন বানু এই কাহিনি দিয়ে। শুধু তাই নয় নিপীড়িত মূক ব্যক্তিসত্তার সামনে তিনি প্রতিবাদের জ্বলন্ত আগুন এগিয়ে দিয়েছেন। এখন শুধু গ্রহনের অপেক্ষা। এ বই পাঠককে উদ্বুদ্ধ করার, সচেতন করার বই।

অনুবাদ সাহিত্যের খোলা জানালা দিয়ে ভিন্ন সংস্কৃতিপুষ্ট ভিন্ন সাহিত্যের নতুন চিন্তা ভাবনার আগমন হয়। গ্রহীতা সাহিত্যর মননশীল ও সৃজনশীল পাঠকের মনে এই নতুন ভাবনা আরো নতুন নতুন সৃষ্টিতে সহায়তা করে। "Convenience Store Woman" (2016) নামে জাপানি ভাষায় লেখা (English Translation by Ginny Tapley Takemori ; 2018) ছোট একটি উপন্যাস পড়লাম। লেখিকা Sayata Murata। গল্পে আছে এক তরুনী কী অসম্ভব রকমে ভালবাসত Convenience store এ কাজ করতে। সে ভালবাসা প্রায় Obsession এর পর্যায়ে চলে গেছিল। আমরা দুটি জীবন্ত প্রানের পরস্পরের প্রতি আসক্তির কথা জানি। কিন্তু জঙ্গমের সঙ্গে স্থাবরের প্রেমের কথা শুনি নি। এটি আমার কাছে সম্পূর্ণ একটি নতুন ভাবনা। এই ধরনের ভাবনা নতুন সৃষ্টির ইন্ধন যোগায়। যেমন এক আলো থেকে অন্য আলো জ্বালানো যায় সেরকমই। ইতিহাস সে কথাই বলে। যেমন অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত রোমান কবি Ovid এর রচনা Metamorphoses। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিশ্ব সাহিত্য জগতে বন্দিত। শারিরীক রূপান্তর – এ বইটির প্রধান বিষয়বস্তু। তিনি বলেছেন এই পৃথিবীতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল, যা কিছু জন্মেছে এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর মধেই তাঁর পরিবর্তনের বীজ নিহিত।

অনুবাদ সাহিত্যের খোলা জানালা দিয়ে ভিন্ন সংস্কৃতিপুষ্ট ভিন্ন সাহিত্যের নতুন চিন্তা-ভাবনার আগমন হয়।

Ovid এর এই অসাধারণ চিন্তাদর্শন আশ্রয় করে অনেক রচনা সৃষ্ট হয়েছে। Franz Kafka র Metamorphosis (1915 ; বাঙলা অনুবাদ ঃ কবীর চৌধুরী , ১৯৯০) - যা একটি যুগান্তকারী লেখা – তাঁর অন্যতম নিদর্শন। এখানে গল্পের প্রধান চরিত্র একদিন সকালে উঠে দেখে সে একটি কীট বা পোকায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ এক বিচিত্র চরিত্র। George Barnerd Shaw লিখেছেন Pygmalion ১৯১৩ সালে। যেটা অবলম্বন করে হলিউডের বিখ্যাত জনপ্রিয় সিনেমা My Fair Lady তৈরি হয়েছিল। অবশ্য তাঁর আগেই ১৮৭১ সালে W.S. Gilbert নামে একজন নাট্যকার Pygmalion and Galatea নামে একটি Musical drama লিখে ফেলেছিলেন। বাংলার বিখ্যাত অভিনেতা, লেখক ও নাট্যকার উৎপল দত্তের ১৯৭৬ সালে লেখা 'টিনের তলোয়ার' এ Pygmalion এর ছায়া আছে (Reedsy.com)। George Orwell এর Animal Farm এর ভাবনায় লিখেছেন শ্রী রমাপদ চৌধুরী "বাড়ি বদলে যায়" (১৯৬৪)। এই ভাবে অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে যে নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা ঘটে সেটা অন্য ভাষার লেখকদের সৃষ্টিশীল প্রকাশক্ষমতার পরিধি বাড়িয়ে দেয়। একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমেই আরও অনেক সৃষ্টির বীজ তৈরি করে। এখানেই অনুবাদ সাহিত্যের সার্থকতা। সাম্প্রতিক কালে (বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন , ২০২৬) বিখ্যাত ব্রিটিশ আমেরিকান লেখিকা ঝুম্পা লাহিড়ী আনন্দবাজারে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে বলেন Ovid এর Metamorphoses এর অনুবাদের কাজ তিনি শুরু করেছেন। এটুকুই তিনি বলেছেন। তিনি কী ভাষায় অনুবাদ করবেন বলেন নি।

শুধু উপন্যাস নয় ছোট গল্পের ভেতর দিয়ে আমরা বহু বিচিত্ররকমের চরিত্রের সন্ধান পাই। যা আমদের কল্পনার সীমানা অতিক্রম করে যায়। চেক লেখক Milan Kundera র গল্পসংকলন "Laughable Loves" (1974) এ এমনই কিছু চরিত্রকে দেখি। বিশেষত প্রথম গল্পটির যে কথক সেই চরিত্রটিকে। ইনি একজন শিল্পকলা সমালোচক বিষয়ের অধ্যাপক এবং খুবই সাধারণ মাপের। একটি খারাপ প্রবন্ধ এসেছে তাঁর কাছে। এটির মূল্যায়ন করতে হবে তাকে। কিন্তু সবাই প্রবন্ধটিকে নিকৃষ্ট বলেছেন। লেখাটি আসলে খারাপ সেটা অধ্যাপক নিজেই ভালো করে বোঝেন। কিন্তু তিনি এক অদ্ভুত মনোবিকারের শিকার। তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবেন এবংঅন্যকে মূর্খ ও বোকা ভাবেন। নিজেকে সবার চাইতে আলাদা এবং সেরা সমালোচক প্রমাণ করতে তিনি সেই লেখাকে কিছুতেই খারাপ বলতে রাজি নন। সবার মতে মত দিয়ে লেখাটি খারাপ এই সামান্য একটি সত্যকে স্বীকার করতে না চেয়ে, সবার সঙ্গে এক স্তরে নামতে রাজি না হয়ে তিনি তাঁর চাকরি , প্রেমিকা ও সর্বস্ব হারান। তবুও শেষ অব্দি তিনি ভাবেন তিনি যা করেছেন তা ঠিক এবংআশেপাশের সবাই যা করলো তা বেশ হাস্যকর। এই অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব আমাদের কাছে নতুন বলেই প্রতিভাত হয়।

তবু আশ্চর্য হই অনুবাদ সাহিত্যের পরিসংখ্যান দেখে। আমেরিকাতে ইংরেজী ভাষায় লেখা সাহিত্যের মোট বইয়ের ৩% শতাংশ অনুবাদ হয়েছে ২০১৩ সালে। যদিও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলোর বেশির ভাগই ইংরেজীতে লেখা নয় এবংঅধিকাংশই ইংরেজীতে অনুদিত হয়েছে। সে সব ধরেও ইংরেজী ভাষায় অনুদিত বইয়ের সংখ্যা দুঃখজনক ভাবে কম। বাঙলায় অনুদিত বইয়ের সংখ্যা শতকরা হিসেবে কত তাঁর পরিসংখ্যান জানি না। গুগল অনুযায়ী ; Nationa Library ১২০ থেকে ১৬০ টি অনুদিত বই প্রতিদিন তালিকাভুক্ত করেন। কতগুলো বাংলায় অনুদিত বা কতগুলো বাঙলা থেকে অনূদিত তার পরিসংখ্যান নেই। তবে আশার কথা এই যে এই পরিসংখ্যানটি অনেক পুরনো এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রচুর বই অনুদিত হয় পশ্চিম বঙ্গে। সেটা ধরতে হবে। লিটল মাগাজিন গুলো (ওয়েব জিন সহ) প্রচুর অনুবাদ করে। সাধারণত তাদের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকে অনুবাদ সাহিত্যের জন্য। Antonym নামে একটি অন্তর্জাল পত্রিকা শুধু অনুবাদ সাহিত্যের জন্য আছে এবং সেখানে নতুন পুরনো সব রকম সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

৩%

আমেরিকায় ইংরেজিতে লেখা মোট বইয়ের মাত্র ৩% অনুবাদ — ২০১৩

The new publishing standard (২০২৩) নামে একটি websight বলছে সারা বিশ্বে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহের বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। সেটা ভারতের অভ্যন্তরীন বাজারেও সত্যি। ২০১০ সালে প্রকাশিত Edith Grossman এর Why Translation Matters লেখাটিতে তিনি বলেছিলেন আনুবাদকরা একেবারেই অবহেলিত। সেই অবস্থা কিন্তু এখন প্রায় নেই। অনেক সাহিত্য প্রতিযোগিতাতে অনুবাদ সাহিত্যকে মৌলিক সাহিত্যের সাথে যোগ দিতে বলা হয়। কারণ অনুবাদকে একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি হিসেবে দেখা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে Heart Lamp এর লেখিকা বানু মোস্তাক এর সাথে এর অনুবাদক Deepa Vasti কেও একই পুরস্কারে (International Booker Prize) পুরস্কৃত করা হয়েছে।

কারণ Steiner (Aspects of Language and Translation : George Steiner , 1975, Oxford University Press) এর core concept হল যেহেতু অনুবাদের জন্য দরকার মননশীল ব্যাখ্যা absolute equivalence is impossible. মৌলিক লেখাটিকে বুঝতে গেলে আমরা আমাদের নিজস্ব চিন্তার ব্যাপ্ত সীমানা বা পরিধি দিয়ে বুঝি। এই উপলব্ধিই অনুবাদ। অনুবাদিত লেখা তাই অনুবাদকের নিজস্ব বিশ্বাস , তৎকালীন সময় বা কাল, এবং তাঁর প্রবণতা দিয়ে রঞ্জিত থাকবেই। সুতরাংবলাই যায় অনুবাদ একটি স্বতন্ত্র লেখা। Mexican কবি , দার্শনিক, কূটনীতিবিদ ,ও গল্প লেখক Octavio Paz language প্রসঙ্গে একই রকম বলেছেন – there are no original text (as all writings is merely a translation of non-visual world) means that the translator is free to create their own work . (Review of Why Translation Matters by Edith Grossman : Worldpress.com)। তাই অনুবাদকের একই পুরস্কার পাওয়া যথার্থ বলে বিবেচিত।

সম্প্রতি Sydney Writers Festval এ বিখ্যাত লেখক অমিতাভ ঘোষ এর এক সাক্ষাৎকারে এ কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল। তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস the Ghost Eye লিখতে গিয়ে তিনি অনুভব করেছেন তাঁর ভেতরে কোন এক third agency তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছেন। প্রশ্ন করলে হয়ত জানা যাবে বেশি ভাগ কবি সাহিত্যিকই এই তৃতীয় শক্তির উপস্থিতি অনুভব করেন লেখার সময়ে।

ছোট মামার তক্র শরবতের রহস্য তাই আজ পরিস্কার হয়। সত্যিই দুগ্ধ থেকে দুগ্ধ তৈরি করা যায় না – দুধের রূপান্তরে তৈরি হয় তক্র বা ঘোল নামক পানীয়। সে তক্র অসাধারণ সুস্বাদু এবং স্বাস্থের পক্ষে উপকারী। অনুবাদ সাহিত্য রূপী এই সুস্বাদু তক্র বিশ্ব সাহিত্যের স্বাস্থের পক্ষেও জরুরী একটি উপাদান। না হলে আমরা একই চিন্তাদর্শন এর ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে থাকতাম এবংআমাদের সাহিত্য স্বাস্থের কোন উন্নতি বা প্রসার হতো না।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অসীম রহস্যে ভরা। আমাদের মানস্ লোক সেই ব্রহ্মাণ্ডেরই যেন ক্ষুদ্র একটি সংস্করণ। তাই সেখানেও অসীম রহস্যের অনুভূতি। সেই অনুভূতি প্রকাশ করার মত শব্দ ভাণ্ডার এখনও সৃষ্টি হয়নি। অনুবাদের রাজপথ দিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয় অজানা অনুভূতি। মনের রহস্যে আলো পড়ে। সৃষ্ট হয় নতুন শব্দ ভাণ্ডার। সাহিত্য এগিয়ে যায় আর এক কদম।



সাহিত্য প্রসারে অনুবাদ সাহিত্যের অবদান



শ্রীজীব মুখার্জী



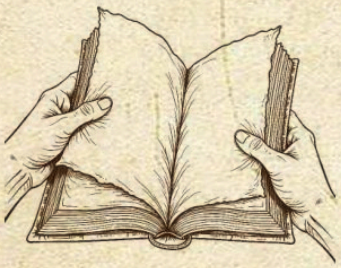
সিডনির আকাশে যখন বৈশাখী মেলার ঢাক বাজে, কিংবা কোনও ঘরোয়া আসরে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মুখে ইংরেজি-বাংলা মিশ্র উচ্চারণে কবিতা শোনা যায়, তখন বোঝা যায়—প্রবাসে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, স্মৃতি ও পরিচয়ের আশ্রয়। এই আশ্রয়কে বড় করে তোলে সাহিত্য। আর সাহিত্যকে নিজের আঙিনা ছাড়িয়ে অন্যের আঙিনায় নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে প্রাচীন, ধৈর্যশীল এবংপ্রয়োজনীয় কাজটির নাম অনুবাদ।

অনুবাদকে আমরা অনেক সময় খুব সরলভাবে ভাবি—এক ভাষার শব্দকে আরেক ভাষায় বসিয়ে দেওয়া। কিন্তু সত্যিকারের অনুবাদ তার চেয়ে অনেক বেশি। সেখানে শব্দের সঙ্গে আসে সময়, সমাজ, রস, ব্যথা, হাসি, রাগ, বিদ্রোহ, প্রেম, ধর্ম, রাজনীতি—একটি ভাষার ভিতরে লুকিয়ে থাকা মানুষের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা। অনুবাদক তাই শুধু ভাষাজ্ঞ নন; তিনি একধরনের সাংস্কৃতিক দূত। তিনি দরজার কড়া নাড়েন: 'দেখুন, এই ঘরটিও মানুষের।'



রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' যখন ইংরেজিতে পৌঁছল, তখন বাংলা কাব্যের অন্তরঙ্গ সুর বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একটি নতুন ঠিকানা পেল। আবার রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতার সেই আকাঙ্ক্ষা—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'—অনুবাদ সাহিত্যেরও যেন মন্ত্র। কারণ অনুবাদ পাঠকের চিত্তকে ভয়শূন্য করে; অচেনাকে চিনতে শেখায়, দূরকে আপন করে। একটি জাতি যখন অন্য জাতির সাহিত্য পড়ে, তখন সে শুধু গল্প পড়ে না; সে অন্য মানুষের চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখতে শেখে।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার ইতিহাসে অনুবাদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজচিন্তার সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটেছিল মূলত অনুবাদ ও রূপান্তরের মাধ্যমে। শেক্সপিয়র, মিল্টন, মলিয়ের, স্কট, দ্যুমা থেকে শুরু করে পরে টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, গোর্কি, ইবসেন, ব্রেখট—এই সব নাম বাঙালি পাঠকের ঘরে এসেছে অনুবাদের পথ ধরে। সেই আগমন বাংলা গদ্য, নাটক, উপন্যাস ও সমালোচনাকে নতুন ছাঁচে ভাবতে সাহায্য করেছে।



তবে অনুবাদের প্রভাব একমুখী নয়। বাংলা ভাষাও বিশ্বকে দিয়েছে অনেক কিছু। রবীন্দ্রনাথের আত্মঅনুবাদ, জীবনানন্দের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ, বিভূতিভূষণ, মানিক, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল, হাসান আজিজুল হক, হুমায়ূন আহমেদ—বিভিন্ন সময়ে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য অন্য ভাষার পাঠকের কাছে পৌঁছেছে। এর মধ্যেই সাহিত্য প্রসারের আসল সৌন্দর্য: আমরা যেমন গ্রহণ করি, তেমনি দিইও।

কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদচর্চা এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের রুবাই অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি কেবল পারস্য কাব্যের ভাব বাংলায় আনেননি; তিনি তার সুরকে বাঙালি কানে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। অনুবাদ এখানে আক্ষরিক আনুগত্য নয়, এক সৃজনশীল পুনর্জন্ম। নজরুলের নিজের উচ্চারণ—'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই'—এই মানবতাবাদী মর্মবোধই অনুবাদ সাহিত্যের প্রাণ।

পশ্চিমবঙ্গের অনুবাদ-পরিসরে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পরে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণাভ সিনহা প্রমুখ নানা সময়ে বিশ্বসাহিত্যের দরজা খুলেছেন। বোদলেয়ার, রিলকে, নেরুদা, লোরকা, কাফকা, কামু—এইসব সাহিত্যিকদের সঙ্গে বাংলার পরিচয় পাঠকের রুচিকে প্রসারিত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে কবীর চৌধুরী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখের কাজ আমাদের দেখায়, অনুবাদ শুধু বইয়ের তাক ভরায় না; এটি পাঠকের বৌদ্ধিক পরিসর বড় করে। দুই বাংলার অনুবাদকরা যেন একই নদীর দুই তীর থেকে জল এনেছেন বাংলা ভাষার মূল স্রোতে।

অনুবাদের এই আলো শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়; গানেও তার গভীর প্রভাব আছে। পল রবসনের কণ্ঠে বিখ্যাত 'Ol' Man River'-এর যে নদী, নিপীড়ন ও মানবব্যথার প্রতীক, ভূপেন হাজারিকার হাতে তা ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, মানুষের আর্তি ও প্রতিবাদের ভারতীয় উপমায় রূপ নেয় —'বিস্তীর্ণ দুপারের' বা বাংলা শ্রোতার পরিচিত 'ও গঙ্গা তুমি'-র মতো গানে। আবার সলিল চৌধুরীর সৃষ্টিতে হ্যারি বেলাফন্টের 'Jamaica Farewell'-এর সুরাত্মীয়তা বাঙালি শ্রোতাকে বুঝিয়েছে, ক্যারিবিয়ান দ্বীপের বিচ্ছেদ ও স্মৃতিও বাংলার নদীতীর, পথের প্রান্ত বা ঘরে ফেরার আকুলতার সঙ্গে মিশে যেতে পারে। কবীর সুমনের 'কতটা পথ পেরোলে'—যার আবহে আমরা বব ডিলানের 'Blowin' in the Wind'-এর প্রশ্নমুখর প্রতিবাদী সুরের প্রতিধ্বনি শুনি—বাংলা শ্রোতাকে দেখিয়েছিল, বিশ্বমানবতার প্রশ্ন বাংলাতেও একইরকম তীক্ষ্ণ হতে পারে। 'তুমি আসবেই, আমি জানি' ধরনের আশাবাদী উচ্চারণও সেই কারণেই আমাদের কাছে শুধু বিদেশি গানের অনুবাদ নয়, এক নতুন সময়ের বাংলা ভাষা হয়ে ওঠে। এখানে অনুবাদ সুরেরও, মানসিকতারও। অর্থাৎ অনুবাদ শুধু শব্দ বদলায় না; কখনও সে ভূগোল বদলে দেয়, অথচ মানুষের অনুভূতিকে অক্ষত রাখে।

অনুবাদ সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দান সম্ভবত সহানুভূতি। দস্তয়েভস্কির অপরাধবোধ, টলস্টয়ের নৈতিক দ্বন্দ্ব, নেরুদার প্রেম ও প্রতিবাদ, লোরকার স্পেন, কিংবা মুরাকামির নিঃসঙ্গতা—এসব পড়তে পড়তে বুঝি, মানুষের অভিজ্ঞতার ভূগোল আলাদা হলেও হৃদয়ের মানচিত্র আশ্চর্যভাবে মিলেমিশে যায়। চণ্ডীদাসের সেই চিরন্তন বাণী—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—অনুবাদের ভিতর নতুন অর্থ পায়। ভাষা বদলায়, মানুষ থেকে যায়।

অবশ্য অনুবাদ সবসময় সহজ বা নির্ভুল নয়। কোনও ভাষার রস, ছন্দ, প্রবাদ, স্থানীয় গন্ধ, সামাজিক ইঙ্গিত—সবটুকু অন্য ভাষায় অক্ষত রাখা প্রায় অসম্ভব। ইতালীয় প্রবাদে অনুবাদককে কখনও 'বিশ্বাসঘাতক' বলা হয়েছে। কথাটিতে রস আছে, আবার সতর্কতাও আছে। খারাপ অনুবাদ সাহিত্যের প্রাণ শুকিয়ে দিতে পারে; ভালো অনুবাদ মৃত অক্ষরেও জীবন ফিরিয়ে আনে। তাই অনুবাদে দরকার ভাষাজ্ঞান, সাহিত্যবোধ, সংস্কৃতিসচেতনতা এবংসবচেয়ে বেশি দরকার বিনয়। অনুবাদককে জানতে হয় কোথায় নিজের ভাষাকে এগিয়ে দিতে হবে, কোথায় মূল রচনার সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

প্রবাসী বাঙালির জন্য অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্ব আরও আলাদা। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো বাংলা ও ইংরেজি—দুই ভাষার মাঝখানে বড় হচ্ছে। তাদের কাছে বাংলা সাহিত্য পৌঁছে দিতে যেমন সহজ ভাষান্তর প্রয়োজন, তেমনি বাংলা সাহিত্যের সৌন্দর্যকে ইংরেজি বা অন্য ভাষাতেও পৌঁছে দেওয়া দরকার। সিডনির বহুসাংস্কৃতিক সমাজে 'বাংলা'কে কেবল নস্টালজিয়া করে রাখলে চলবে না; তাকে কথোপকথনে আনতে হবে। অনুবাদ সেই কথোপকথনের ভাষা।

আজকের দিনে অনুবাদ আরও জরুরি, কারণ পৃথিবী একদিকে কাছাকাছি এসেছে, অন্যদিকে বিভাজনের ভাষাও বেড়েছে। সাহিত্য আমাদের শেখায় শুনতে; অনুবাদ শেখায় অন্যের ভাষায় সেই শোনাকে সম্ভব করতে। একটি ভালো অনুবাদ পাঠককে বলে—তোমার একার দুঃখ নয়, অন্যরাও কেঁদেছে; তোমার একার আনন্দ নয়, অন্যরাও গেয়েছে; তোমার একার লড়াই নয়, দূরদেশেও মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "নিন্দা করতে গেলে বাইরে থেকেই করা যায়, কিন্তু বিচার করতে গেলে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়।" অনুবাদ আমাদের সেই "ভিতরে প্রবেশ" করার সুযোগ দেয়। অন্য ভাষার সাহিত্যকে অনুবাদের মাধ্যমে পড়া মানে অন্য সভ্যতার ভিতরে প্রবেশ করা, তার মানুষকে বোঝা, তার আনন্দ-বেদনার পাশে বসা।

"নিন্দা করতে গেলে বাইরে থেকেই করা যায়, কিন্তু বিচার করতে গেলে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়।" — রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য প্রসারে অনুবাদ তাই কোনও পার্শ্বচর্চা নয়, সাহিত্যচর্চারই এক কেন্দ্রীয় অঙ্গ। অনুবাদ না থাকলে বাংলা সাহিত্য হয়তো নিজের ভেতরেই সুন্দর থাকত, কিন্তু এত প্রশস্ত হতো না। আর বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার পথও এত সুগম হতো না। অনুবাদকরা অনেক সময় আলোয় থাকেন না, কিন্তু তাঁদের হাতেই জ্বলে সেতুর প্রদীপ।

শেষ পর্যন্ত সাহিত্য মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের শিল্প। অনুবাদ সেই মিলনের সেতু, কখনও নৌকা, কখনও জানালা। এই জানালা দিয়ে বাংলা বিশ্বকে দেখুক, আর বিশ্ব দেখুক বাংলাকে—এই হোক আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যচর্চার আনন্দ ও অঙ্গীকার।

সাহিত্য প্রসারে অনুবাদ সাহিত্যের অবদান



জামিল হাসান সুজন



খুব ছোটবেলায় রুশ সাহিত্যের সাথে পরিচয় হয় শ্রী ননী ভৌমিকের হাত ধরে। সে ছিল এক স্বপ্নের জগত। 'রুশ দেশের উপকথা', 'রূপের ডালি খেলা', 'উভচর মানুষ', এরকম নানাবিধ বই। পরবর্তীকালে হাতে এল রাশিয়ান সব বিখ্যাত লেখক লিও তলস্তয়, ম্যাক্সিম গোরকি, আন্তন চেখভ, ফিওদর দস্তভয়েস্কি এদের বাংলা অনুবাদ বই। বিপুল বিস্ময় ও আগ্রহ নিয়ে সেগুলির রস আস্বাদন করেছি, জেনেছি রুশ সমাজ ব্যবস্থা ও সেখানকার মানুষের ব্যবহারিক জীবন।

অনুবাদ সাহিত্যের ব্যাপারটি বেশ প্রাচীন। এক দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও তাদের জীবনাচার জানার আগ্রহ অন্য দেশ ও ভাষাভাষী মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার একটি অংশ।

কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে, প্রত্যেকটি ভাষার একটি নিজস্বরচনা শৈলী রয়েছে, আমি যদি শুধু আক্ষরিক অনুবাদ করি তাহলে সেটা হবে নিরেট খটমটে, দুর্বোধ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি যদি I miss you কথাটির অনুবাদ করতে চাই তাহলে বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার কাছে প্রকাশ করা বেশ কঠিন হবে। হয় আমাকে বলতে হবে, আমি তোমাকে মিস করি অথবা তোমার কথা খুব মনে পড়ে। অর্থাৎ আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ করতে হবে। ইংরেজি অনেক শব্দ আছে যার সরাসরি কোন উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ নেই, আবার যদি থাকেও, দেখা যায় শব্দটি অপ্রচলিত। যেমন ইংরেজিতে available কথাটির বাংলা অর্থ অভিধানে রয়েছে 'উপলব্ধ'। আমার মনে হয়না এই শব্দটির প্রয়োগ পাঠকপাঠিকার কাছে সহজবোধ্য হবে। এভাবেই যারা অনুবাদ করে তাদের উপযুক্ত শব্দ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে ভাবতে হয়। সুতরাংঅনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার লোকের কাছে লেখাটি সহজবোধ্য হতে হবে এবং সেটা হতে হবে আমাদের মত করে, এমনকি আমাদের আবেগ ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে। তাহলেই একটি অনুবাদকর্ম সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

I miss you ⟷ তোমার কথা খুব মনে পড়ে



এখন দেখা যাক, সাহিত্য প্রসারে অনুবাদ সাহিত্যের অবদান প্রসঙ্গে। আসলে মৌলিক লেখার পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্যও পাঠক মহলে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত লেখকদের গল্প উপন্যাস আমাদের বাংলা সাহিত্যে সমাদৃত হয়েছে। বিষয়টি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত হলেও মন্দ কি, কারণ পরদেশী ভাষা আয়ত্ব করে সে ভাষায় বইটি পড়া বেশিরভাগ মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তবে যারা অনুবাদ কর্ম করে তাদের দুটি ভাষাতেই দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

একটি অনুবাদকর্ম সাহিত্য প্রসারে পাঠক পাঠিকার আকর্ষণের পাশাপাশি উভয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দুটোরই উত্তরণ ঘটায়। অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পাঠক পাঠিকার পরিচয় ঘটে। তারা জানতে পারে তাদের জীবনাচার ও মূল্যবোধ। একটা অদৃশ্য সুতার বন্ধন সৃষ্টি হয় অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে।

বাংলা ভাষায় পৃথিবীর বিখ্যাত লেখকদের লেখাগুলি অনুবাদ হয়েছে, যেমন মোপাসা, ও হেনরি, আরনেস্ট হেমিংওয়ে প্রমুখ। এঁদের লেখা পড়ে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। জীবনের অন্য এক বোধ আমাদেরকে নাড়া দিয়েছে এবংআমাদের বাংলা সাহিত্য নিঃসন্দেহে অনেক বেশি ঋদ্ধ হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্যকে কোনভাবেই ছোট করে দেখার উপায় নাই। আমাদের চিন্তা ও মননে নতুন কিছু শানিত করার এ এক অভিনব উপায়। আরও বেশি অনুবাদ সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার ঘটুক এবং বাংলা সাহিত্য আরও বেশি সমৃদ্ধ হোক এই কামনা করে আজকের এই লেখার পরিসমাপ্তি টানছি।

অনুবাদ সাহিত্যের পরিব্যাপ্তি



লুৎফর রহমান খান



নোবেলবিজয়ী সাহিত্যিক হোসে সারামাগো বলেছিলেন, 'লেখকেরা নির্মাণ করেন জাতীয় সাহিত্য, আর অনুবাদকেরা নির্মাণ করেন বিশ্ব সাহিত্য'। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পৃথিবীতে তিন হাজারের উপর লিখিত ভাষা আছে যাতে সাহিত্য রচনার সুযোগ রয়েছে, তবে এগুলোর অধিকাংশতেই উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম নেই। অন্যদিকে প্রায় পঁচিশটা ভাষায় লেখা সাহিত্যকর্ম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে। নোবেল বিচারকদের পক্ষে সবসময় মূল ভাষায় লেখা সাহিত্যকর্ম পড়া সম্ভব হয় না, তাঁরা নির্ভর করেন অনুবাদিত লেখাটির উপর। আমাদের কাছের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, যার ইংরেজি অনুবাদ বিচারকেরা পড়েছিলেন। ভাষার সীমানা অতিক্রম করার জন্য অনুবাদের বিকল্প নেই। কোনও সাহিত্যকর্ম যদি নোবেল, বুকার বা অন্য কোনও নামী আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়, সেই লেখা বহু ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে, যার ফলে মূল লেখাটি অন্য ভাষাভাষীদের কাছে পৌঁছে যায়। এর একটা বাণিজ্যিক দিক আছে, তবে সেখানেও উদ্দেশ্য অন্য ভাষার মানুষের কাছে পৌঁছানো।

লেখকেরা নির্মাণ করেন জাতীয় সাহিত্য, আর অনুবাদকেরা নির্মাণ করেন বিশ্ব সাহিত্য। - হোসে সারামাগো

অনুবাদের প্রয়োজন তো অনস্বীকার্য, তবে অনুবাদ করা কি সহজ? একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি।

স্কুলজীবনে আমাদের একজন ইংরেজির শিক্ষক মজার কাজ দিতেন। সেকালে বাংলা থেকে ইংরেজি করাকে বলা হতো 'ট্রানস্লেশন', আর ইংরেজি থেকে বাংলা করাকে 'রিট্রানস্লেশন'। উনি আমাদের সুকুমার রায়-এর অবাক জলপান থেকে কয়েক লাইন-এর 'ট্রানস্লেশন' করতে বললেন।

পথিক: *মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?*

ঝুড়িওয়ালা: *জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান দিতে পারি।*

পথিক: *না, না, আমি তা বলিনি –*

ঝুড়িওয়ালা: *না, কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না।*

এই নাট্যাংশের ইংরেজি করা কঠিন নয়, তবে মূল অর্থ বজায় রেখে অনুবাদ করা সম্ভব কি? বাংলাতে যে জল পাই আর জলপাই আলাদা অর্থ বহন করে, তা অনুবাদে প্রকাশ করা দুরূহ।

একটি ভাষার কথ্য ও লেখ্য ধরণ, এবংশব্দসম্ভার, অন্য ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে বড় বাধা, তা সকলেই স্বীকার করবেন। সেই সঙ্গে মূল লেখা যে ভাষায় রচিত, সে ভাষার মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, এবংআর্থ-সামাজিক পরিবেশ ভাষান্তরের জন্য সমস্যাসংকুল। উৎস-ভাষার মানুষদের এই দিকগুলি লক্ষ্য-ভাষার মানুষদের কাছে বোধগম্য করা সহজ নয়। একটি অনুবাদের
মান নির্ভর করে কতটা দক্ষতার সঙ্গে এই কাজটি করা হয়েছে, তার ওপর। এই দক্ষতা নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি হল 'ট্রান্সলেশন' করার পরে 'রিট্রান্সলেশন' করে মূল লেখায় ফিরে যাওয়া যায় কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা। ব্যাপারটি

মোটেও সহজ নয়, তবে আমার দেখা ছোট্ট একটি ঘটনা বলি।



একবার চিনের বেইজিং-এ একটি কনফারেন্সে গিয়েছিলাম, সেখানে হোটেলের পাশেই কয়েকজন ক্যালিগ্রাফার অল্প সম্মানীর বিনিময়ে সুন্দর হস্তাক্ষরে চিনা ভাষায় লিখে দিচ্ছিলেন সবার নাম। আমাদের সঙ্গে এক বাঙালি ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর নামে একাধিক য-ফলা ও যুক্তাক্ষর ছিল। নিজের নাম একজনকে দিয়ে লিখিয়ে তিনি অন্য একজনের কাছে গেলেন, ওই নামটি চিনা ভাষা থেকে পড়ে শোনাতে, যাতে তিনি বুঝতে পারেন কাজটি ভাল হয়েছে কি না। এই 'রিট্রানস্লেশনে' তিনি সন্তুষ্টই হয়েছিলেন।

মুল লেখার সঙ্গে তূলনা করে অনূদিত সাহিত্যকর্মগুলিকে আমরা একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বা continuum হিসাবে দেখতে পারি। এক প্রান্তে আছে আক্ষরিক অনুবাদ, অর্থাৎ মূল লেখার অর্থ ও প্রকৃতি, এমনকি রচনাপদ্ধতিও অনুসরণ করে, যে অনুবাদ করা হয়। অন্যপ্রান্তে আছে সেই সকল লেখা, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে অনুবাদই মনে হবে না, মূল গল্প বা কবিতার ছায়া অবলম্বনে নির্মিত কোনও লেখা। এই দুই প্রান্তের মাঝখানে আছে সেই সকল ভাষান্তর, যেগুলোকে বলা যায় ভাবানুবাদ। ভাবানুবাদ করা সাহিত্যকর্মের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু অনুবাদে মূল রচনা থেকে সামান্য সরে আসা হয়েছে, আবার কোনোটিতে অনেকখানি। ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। প্রথমে একটি মূলানুগ অনুবাদ, পরে বিভিন্ন স্তরের ভাবানুবাদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেলজয়ী বাঙালি কবি, কিন্তু তিনি পশ্চিমা সাহিত্যেও পারদর্শী ছিলেন। অনেকগুলো ইংরেজি কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন, তার একটি পি বি শেলী'র *The World's Wanderers* কবিতাখানি। কবিতাদুটির প্রথম চার লাইন এরকম।

The World's Wanderers

Tell me, thou star, whose wings of light
Speed thee in thy fiery flight,
In what cavern of the night
Will thy pinions close now?

যথার্থ দোসর

হে তারকা, ছুটিতেছ আলোকের পাখা ধরে,
তোমারে শুধাই আমি, বলো গো বলো গো মোরে,
তুমি তারা রজনীর কোন্ গুহা মাঝে যাবে?
আলোকের ডানাগুলি মুদিয়া রাখিতে পাবে?

মূল রচনা এবংঅনুবাদটির মধ্যে অর্থের পার্থক্য নেই। বারো লাইনের দুটি কবিতাই অন্তঃমিল ছন্দে রচিত, যদিও ছন্দ সামান্য আলাদা। নামকরণও ভিন্ন। এসব সত্ত্বেও এই অনুবাদটি আক্ষরিক অনুবাদ। যখন কোনও সাহিত্যকর্মের অনুবাদ হাতে নেওয়া হয়, আক্ষরিক অনুবাদের কথাই বোঝানো হয়ে থাকে। অজস্র উদাহরণ আছে, যেমন ফখরুল আলম-এর An Ocean of Sorrow মীর মশাররফ হোসেন-এর বিষাদ সিন্ধু-র অনুবাদ, অথবা ক্লিনটন সিলি-র it rained all night বুদ্ধদেব বসু-র রাত ভ'রে বৃষ্টি-র অনুবাদ। আর ইংরেজি থেকে বাংলা করা বইয়ের অন্ত নেই, খুঁজলেই বিখ্যাত বইগুলোর প্রতিটার একাধিক বাংলা অনুবাদ পাওয়া যাবে, যেমন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে-র *The Old Man and the Sea*

অথবা ম্যাক্সিম গোর্কি-র *Mother*।

জীবনানন্দ দাশ-এর একটি জনপ্রিয় কবিতা হায় চিল। কোনও কোনও সমালোচকের মতে কবিতাটি ডাব্লিউ বি ইয়েটস-এর *He Reproves The Curlew* কবিতার অনুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদ হয়তো নয়, তবে ভাবের মিল ভীষণভাবে লক্ষণীয়। ইয়েটস-এর ছয় লাইনের কবিতাটি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত।

O CURLEW, cry no more in the air,
Or only to the water in the West;
Because your crying brings to my mind
Passion-dimmed eyes and long heavy hair
That was shaken out over my breast:
There is enough evil in the crying of wind.

হায় চিল, সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।
পৃথিবীর রাঙ্গা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!

জীবনানন্দ দাশ ১৯৩৬ সাল নাগাদ লিখেছিলেন হায় চিল কবিতাটি, আট লাইনে। চিল আর কারলিউ পাখি একরকম নয়, তবে বেশ কিছু মিলও আছে। দুটি পাখিই কাঁদে বা কান্নার মতো শব্দ করে, আর সেই কান্নার উপমাই কবিরা ব্যবহার করেছেন। দুটি কবিতার মূল ভাবও এক। তবু এক্ষেত্রে অনুবাদ বলা সমীচীন কি? কবিতাদুটির সাদৃশ্য থাকলেও এটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ।

একজন ইংরেজ পাদ্রী এবংকবি চার্লস কিংসলি ১৮৫০ সালে লিখেছিলেন একটি আবেগঘন কবিতা, *The Sands Of Dee*। চব্বিশ লাইনের এই কবিতাটিতে মেরি নামের এক ইংরেজ গ্রাম্যবালিকার ইংল্যান্ডের ডী নদীতে ডুবে মারা যাওয়ার মর্মস্পর্শী কাহিনি বর্ণিত। একই ভাব নিয়ে প্রায় একশো বছর পরে বাঙালি রাজনীতিবিদ ও কবি হুমায়ুন কবীর রচনা করেন মেঘনায় ঢল নামে আঠারো লাইনের একটি কবিতা। এখানে গ্রামের মেয়ে আমিনার মেঘনা নদীতে ডুবে যাওয়ার হৃদয়বিদারক ঘটনার বিবরণ। মূল কবিতার মতো বাংলা কবিতাটিও অনুপম ছন্দে

রচিত, তবে অনেক পার্থক্যও দৃশ্যমান। কিংসলি-র কবিতাটিতে মেয়েটির মৃত্যুর পরের প্রাঞ্জল বর্ণনা আছে, বাংলা কবিতায় আমিনা-র জন্য আত্মীয়দের উদ্বেগের বর্ণনার প্রাধান্য। তবুও কবিতাদুটি যে একই ভাবধারার, তাতে সন্দেহ নেই। এটি কি অনুবাদ? অবশ্যই, তবে ভাবানুবাদ মাত্র।

"O Mary, go and call the cattle home,
And call the cattle home,
And call the cattle home,
Across the sands of Dee."
The western wind was wild and dank with foam,
And all alone went she.

শোন্ মা আমিনা, রেখে দে রে কাজ ত্বরা করি মাঠে চল,
এলো মেঘনায় জোয়ারের বেলা এখনি নামিবে ঢল।
নদীর কিনার ঘন ঘাসে ভরা
মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় ত্বরা
করিস না দেরি- আসিয়া পড়িবে সহসা অথই জল
মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় ত্বরা মেঘনায় নামে ঢল।

এবার একটি উপন্যাসের কথা। ইংরেজ লেখক অ্যান্থনি হোপ-এর কালজয়ী উপন্যাস *The Prisoner of Zenda,* রচনা ১৮৯৪ সালে। উপন্যাসটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। একই গল্প নিয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস ঝিন্দের বন্দী প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। বাংলা উপন্যাসটিতে মূল লেখার স্বীকৃতি ছিল না বলে যখন সমালোচনা হচ্ছিল, শরদিন্দু বলেছিলেন যে তিনি নামেই বংশপরিচয় স্বীকার করে নিয়েছেন। ঝিন্দের বন্দী উপন্যাসের চরিত্রগুলো ভারতের প্রেক্ষাপটে সাজানো, গল্পেও ভিন্নতা আছে, তবে দুটি লেখার সামঞ্জস্য সহজেই লক্ষণীয়। এটি কি অনুবাদ? লেখক তির্যকভাবে স্বীকার করেছেন। এটিকে নিঃসন্দেহে ভাবানুবাদ বলা যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঝিন্দের বন্দী নামে একটি জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা হয়েছিল ১৯৬১ সালে, আবার গল্পে সামান্য পরিবর্তন এনে হিন্দিতে সিনেমা হয়েছিল ২০১৫ সালে, নাম প্রেম রতন ধন পায়ো।

আলোচনা শেষ করব দু'একটি রহস্য উপন্যাস-এর কথা বলে। ইংরেজ লেখক আর্থার কোনান ডয়েল-এর ১৯০১ সালের বিখ্যাত উপন্যাস *The Hound of the Baskervilles*। এই উপন্যাসের কাহিনি নিয়ে হেমেন্দ্র কুমার রায়-এর লেখা উপন্যাস নিশাচরী বিভীষিকা। তিনি এই বইয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন এই বলে যে লেখাটি 'পাশ্চাত্য আখ্যান অবলম্বনে'। হেমেন্দ্র কুমার পশ্চিমা সাহিত্যের অন্য কয়েকটি কাহিনিও বাংলায় রূপান্তর করেছিলেন, যেমন ব্রাম স্টোকার- এর *Dracula,* আগাথা ক্রিস্টি-র *Ten Little Niggers,* অবশ্যই অন্য শিরোনামে এবং ভারতীয় চরিত্র ও ঘটনার আবহে। নিশাচরী বিভীষিকা অবলম্বনে সিনেমা হয়েছিল জিঘাংসা নামে ১৯৫১ সালে, পরে ঘটনা পরিবর্তন করে ১৯৬২ সালে হিন্দি সিনেমা বীস সাল বাদ। হেমেন্দ্রকুমার-এর মতো পশ্চিমা রহস্য-কাহিনির ছায়া নিয়ে অনেকেই লিখেছেন বাংলায়, যাঁরা কেউ কেউ শুধু বলেছেন 'বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে'। উদাহরণস্বরূপ ঢাকার সেবা প্রকাশনী প্রকাশিত কাজী আনোয়ার হোসেন-এর দুর্গম দুর্গ বইয়ের গল্প অ্যালিস্টিয়ার ম্যাকলিন-এর *The Guns of Navarone* -এর গল্পের হুবহু অনুরূপ। হেমেন্দ্রকুমার, আনোয়ার হোসেন এবংঅন্যান্যদের এইসব ছায়া অবলম্বনে লেখাগুলোও কি অনুবাদ? যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এগুলোকেও এক ধরনের অনুবাদ হিসাবে দেখাই সমীচিন।

অনুবাদসাহিত্যের পরিব্যাপ্তি বিশাল এবং বিভিন্ন অনুবাদকর্মের মধ্যে পার্থক্যও বিস্তর। তবে একথা অনস্বীকার্য যে সাহিত্যানুরাগীদের জীবনে অনুবাদের ভূমিকা অপরিমেয়, হয়তো মূল সাহিত্যের ভূমিকার মতোই।

অনুবাদ সাহিত্য, আমার অভিজ্ঞতা এবং মনোভাব



কৌশিক চক্রবর্তী



পরিচয়

সাহিত্যে অনুবাদ, নাকি অনুবাদে সাহিত্য এই প্রসঙ্গে কিছু লিখতে গেলে যে বিষয়টি প্রথমেই মনে আসে সেটি হচ্ছে একটা বৈচিত্রের মেলবন্ধন I অন্য একটি ভাষা সে তো অন্য এক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, অন্য ধরনের একটি জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত, সেই ভাষাকে যখন আমি নিজের ভাষায় নিয়ে আসছি তৈরি হচ্ছে সংস্কৃতি এবংচিন্তার মিশ্রণ I সাহিত্যে যেমন অনুবাদের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ সেরকম আরেকটি প্রশ্ন জাগে তাহলে কি অনুবাদ থেকেও সাহিত্যরস জন্মাতে পারে, অনুবাদ থেকে সৃষ্টি হতে পারে এমন কিছু, যেটা মানুষকে আনন্দ দেবে এবং মানুষের কাছে পৌঁছবে, তাদের যুক্তি এবং মন স্পর্শ করবে I এই প্রবন্ধে আমি অনুবাদ নিয়ে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করব। তার সাথে থাকবে কিছু বিশ্লেষণ, সীমাবদ্ধতা এবংআগামী দিনে অনুবাদ সাহিত্যের ব্যবহার I

অভিজ্ঞতা ও মনোভাব

ছোটবেলা থেকে অনেক ধরনের অনুবাদ সাহিত্য পড়েছি এবংপরিচয় ঘটেছে অনেক গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদির সাথে I অবশ্য তার অধিকাংশই এসেছে আমার স্কুলের মাস্টারমশাই এবংবন্ধুদের কাছ থেকে। এই গল্প, প্রবন্ধ বা লেখাগুলো ছিল ইংরেজি ভাষা অথবা অন্য ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা I এর জন্য যে একটা প্রবল আগ্রহ এবংউৎসাহ ছিল এটা কিন্তু অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই I



পুরনো স্মৃতি ঘাটলে যে গল্পটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে মনে পড়ে, সেটি হলো স্কুলজীবনে শোনা হল্যান্ডের এক ছোট্ট ছেলে হ্যান্সের গল্প (The Little Dutch Boy)। গল্পে বলা হয়েছিল, একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে সে বাঁধের মধ্যে একটি ছোট ফাঁক দিয়ে জল বের হতে দেখেছিল। বিপদের আশঙ্কা বুঝতে পেরে সে নিজের হাত মুঠো করে সেই ফাঁকে গুজে রেখে সারারাত বসেছিল; তার এই সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির কারণেই পুরো গ্রাম বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায় I বিদেশি সাহিত্য—গল্প, উপন্যাস কিংবা কবিতা—যেগুলো অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলো আমাদের জীবনে বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলেছে। এগুলো শুধু আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করেনি বা বিনোদনের উৎস হয়ে ওঠেনি; বরংআমাদের শিক্ষা, রুচি, কল্পনাশক্তি এবং সাহিত্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তবুও আমার মনে প্রশ্ন জাগে এর কতটা সত্যি?



বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুবাদের অন্য একটি দিকের সঙ্গে পরিচিত হই। আমার কাছে তখন আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে, বাংলা ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যকর্ম যখন অন্য ভাষায়—বিশেষত ইংরেজি বা অন্য কোনো বিদেশি ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন সেই ভাষার পাঠকরা সেটিকে কিভাবে গ্রহণ করেন তাদের অভিজ্ঞতা কেমন হয় এবং সেই সাহিত্য থেকে পড়ার পরে তাদের অনুভূতিটি জানার উৎসাহ ছিল আমার সব সময়। উদাহরণস্বরূপ, আমার কিছু বিদেশি বন্ধু যখন সত্যজিৎ রায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ করা রচনা পড়ে তাদের অনুভূতির কথা আমাকে বলতেন, তখন এক ধরনের বিশেষ আনন্দ অনুভব করতাম। একই সঙ্গে আমি চেষ্টা করতাম তাদের ভালো লাগার সঙ্গে আমার ভালো লাগার মিল-অমিলগুলো খুঁজে দেখতে। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে শুরু করি যে একটি সাহিত্যকর্মের পাঠ-অভিজ্ঞতা শুধু ভাষার উপর নির্ভর করে না; এর সঙ্গে সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং ভাষাগত সংবেদনশীলতারও গভীর সম্পর্ক রয়েছে I এই প্রসঙ্গে অবশ্য ভাষাগত অচেতন পক্ষপাতিত্বের (language-based unconscious bias) বিষয়টিও অস্বীকার করা যায় না।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা শুধু বাংলা সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ইংরেজি অথবা হিন্দি গান, কবিতা কিংবা উর্দু সাহিত্যের অনুবাদ পড়ার ক্ষেত্রেও আমি একই বিষয় লক্ষ্য করেছি। উর্দু কবিতা বা গানের অনুবাদ পড়ে অনেক সৌন্দর্য ও আবেগ অনুভব করা সম্ভব হলেও, মূল ভাষাভাষী পাঠক বা শ্রোতা যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সাংস্কৃতিক গভীরতা অনুভব করেন, তার কিছুটা অংশ হয়তো অনুবাদের পথে হারিয়ে যায়। যে সমস্ত পাঠকরা অনুবাদ সাহিত্য বা অন্যান্য ভাষার সাহিত্যকর্ম নিয়ে বেশি ঘাটাঘাঁটি করেন তারা হয়তো অনেক ভালো বলতে পারবেন I অবশ্য এটি সম্পূর্ণভাবে আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ। হয়তো এই চিন্তাই আমাকে অনুবাদের শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা দুই দিক নিয়েই ভাবতে শিখিয়েছে I

কয়েক বছর আগে Sydney Writers' Festival-এ এক ভিয়েতনামি কবি এবংলেখিকার (Nguyên Phan Quê Mai i.e. নুয়েন ফ্যান মাই) সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁর উপন্যাস Dust Child এবংআরো কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ তিনি দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি কবিতা ছিল তাঁর দিদিমাকে নিয়ে, যেখানে ভিয়েতনামের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং যুদ্ধকালীন মানুষের অনুভূতি অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে ফুটে উঠেছিল। কবিতায় তিনি বলেন, যুদ্ধের (Vietnam War) সময় তাঁর দিদিমা নিখোঁজ হন এবং তাঁর মৃতদেহ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে জানা যায়, যে এলাকায় অসংখ্য মানুষ বোমাবর্ষণে নিহত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন, সেখানে এখন ধান চাষ হয়। কবির উপলব্ধি ছিল, তাঁর দিদিমার শরীরও হয়তো সেই মাটির অংশ হয়ে আছে। তাই সেই মাটিতে জন্মানো ধানের ভাত খেতে গিয়ে তিনি অনুভব করেন, দিদিমা যেন এখনও তাঁর খুব কাছে আছেন। কবিতাটি আবৃত্তি করতে গিয়ে কবির চোখে জল চলে এসেছিল। আমরা যারা কবিতা শুনছিলাম তারা এতটাই মুগ্ধ ছিলাম যে কোন কথা বলতে পারছিলাম না - একটা ভাষা যেটা একদমই আলাদা তাকে কি ভাবে এত সুন্দর করে অনুবাদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার একটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট উদাহরণকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেদিন I

সীমাবদ্ধতা

এখন অনুবাদ সাহিত্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা নিয়ে কথা বলব। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, অনুবাদ একটি অত্যন্ত সাহসী কাজ। আমি একে সাহসী বলছি, কারণ একজন অনুবাদক অন্য একটি ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্মকে নিজের ভাষায় পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভাষা শুধু মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়; সাহিত্যও কেবল ভাবের প্রকাশ নয়। সাহিত্যের নিজস্ব রস, সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শব্দের সঙ্গতি ইত্যাদি রয়েছে। অনেক সময় সাহিত্যের গভীরতম তাৎপর্য অথবা সুক্ষতা ভাষায় প্রকাশিত না হয়ে কোন একটি শব্দের আড়ালে লুকিয়ে যায় I সেখানেই প্রশ্ন জাগে—অনুবাদ কি সেই রস, সৌন্দর্য ও তাৎপর্যকে সম্পূর্ণরূপে বহন করে আনতে পারে?

অনুবাদ একটি অত্যন্ত সাহসী কাজ।

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করি। বেশ কয়েক বছর আগে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলির কিছু কবিতা এবং তার ইংরেজি অনুবাদ পড়েছিলাম। যদিও সাহিত্য সম্পর্কে আমার উপলব্ধি খুব গভীর ছিল না। কিন্তু বাংলা কবিতাটি পড়ে এবংপরে তার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে মূল ভাবটি যথেষ্ট সুন্দরভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা আমার মাতৃভাষা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বাংলার সঙ্গে আমার আবেগগত সংযোগ ছিল বেশি। পরবর্তীকালে সাহিত্য সম্পর্কে আরও কিছুটা জানার সুযোগ হওয়ার পর বিষয়টি নতুনভাবে ভাবতে শুরু করি। তখন উপলব্ধি করি যে অনুবাদ যতই সফল হোক না কেন, মূল ভাষার কিছু সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও আবেগ হয়তো পুরোপুরি স্থানান্তরিত হয় না।

এই প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেনের পরিচিতি ও হিংসা (Identity and Violence: The Illusion of Destiny) গ্রন্থটির কথা

উল্লেখ করা যেতে পারে। বইটি আমি বাংলা ও ইংরেজি, দুই ভাষাতেই পড়েছি। আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হলো, বইটির কিছু ধারণা বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। এতে কিছু ভাষাগত জটিলতা হয়তো প্রকাশ পেয়েছে। এটি কোনো সমালোচনা নয়; বরংহতে পারে অনুবাদের একটি স্বাভাবিক সমস্যা। উদাহরণস্বরূপ, "Illusion of a Singular Identity" ধারণাটি বাংলায় ব্যাখ্যা করতে অনেক বেশি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে তুলনামূলকভাবে ইংরেজি কথাটি কিন্তু অনেক সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল ধারণাকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে অনুবাদককে অতিরিক্ত ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়। এবং স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যদি এটা উনি করতে না পারেন I

দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হলো অনুবাদকের ব্যক্তিগত প্রভাব। একজন অনুবাদক যতই নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করুন না কেন, তার ভাষাবোধ, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা অনুবাদের ওপর কিছুটা প্রভাব ফেলতেই পারে। এটি সবসময় নেতিবাচক নয়, কিন্তু এর ফলে মূল লেখকের কথা বা কণ্ঠস্বর কখনও কখনও কিছুটা আড়াল হলেও হতে পারে I পাবলো নেরুদার কিছু কবিতা ইংরেজি অনুবাদ পড়ার সময় আমার এমন একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমার একজন স্প্যানিশভাষী বন্ধু একই কবিতা পড়ে যে অনুভূতি বা অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন - উনি আমাকে ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবংকথা প্রসঙ্গে বলে রাখি ওনার ইংরেজি ভাষায় দখল যথেষ্ট ভালো, সেখানে, আমি ইংরেজি অনুবাদ পড়ে কিছুটা হলেও অন্যরকম অনুভূতি পেয়েছিলাম। এর অর্থ এই নয় যে অনুবাদ ব্যর্থ হয়েছে; বরংএটা হয়তো স্বাভাবিক যে একজন মাতৃভাষী পাঠক মূল ভাষার শব্দ আবেগ বা সাংস্কৃতিক উপমা থেকে যে গভীর রস নিতে পারে বা অনুবাদ পাঠক হয়তো সেই রস থেকে বঞ্চিত I সুতরাং, অনুবাদ সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটানোর এক চমৎকার মাধ্যম হলেও কিছু সীমাবদ্ধতা তো থাকেই I

সমাপ্তি

আজকের পৃথিবীতে মানুষ শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন কারণে নিজের দেশ ছেড়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করছে। বিশ্বজুড়ে অভিবাসন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটা কিছুটা হয়তো বিশ্বায়নের পরে। কিছুটা হয়তো অন্য কারণে - যেমন হতে পারে অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক অথবা উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত কারণে I বর্তমানে একজন মানুষের জন্ম এক দেশে, শিক্ষা অন্য দেশে এবংকর্মজীবন আরেকটি দেশে এটি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা নয় I একইভাবে বড় বড় প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক এবংমাঝারি মানের প্রতিষ্ঠান এবংসরকারি সংগঠনেও বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতি এবং জাতিগতভাবে বিভিন্ন ধরনের মানুষের একসাথে কাজ করা খুবই উল্লেখযোগ্য। সেখানে বহু সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবংসহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; আর আমার মনে হয় এখানেই অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা রয়েছে।

অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্য অভিজ্ঞতা সহজেই অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। কবিতা, বা গল্প, অথবা প্রবন্ধ সামাজিক মাধ্যম, পত্রিকা বা অন্য মাধ্যমে প্রকাশিত হলে তা আরও বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছায়। এতে মানুষ সহজেই অন্য সংস্কৃতির সাহিত্য পড়তে ও বুঝতে পারে। এক্ষেত্রে সে অন্য সমাজ অথবা অন্য ধরনের মানুষ এবং তাদের জীবনযাত্রাকে আরো বুঝতে ও গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। এখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে I সেক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্য মানুষকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারবে এবং তাদের মধ্যে যে বৈচিত্রতা বা ভিন্নতা সেটিকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করবে I সুতরাং, অনুবাদ সাহিত্য কেবলমাত্র সাহিত্যিক বিনিময়ের মাধ্যম নয় এটি মানবিক সম্পর্ক স্থাপনেও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে I তাহলে হয়তো আরও বেশি অনুবাদচর্চা আমাদের বিশ্বকে আরও সহনশীল ও সুন্দর করে তুলবে।

কিছু সত্যি কথা



তানিম মান্নান



কয়েকদিন আগে সিডনিতে এক কিশোরের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। বয়স পনেরো কিংবা ষোলো। ছেলেটি সাবলীল বাংলায় কথা বলে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বাংলা বই পড়ো?" সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আঙ্কেল, আমি বাংলা বলতে পারি। কিন্তু বাংলা পড়তে পারি না।" আঙ্কেল সম্বোধনটা এখনো ঠিকমতো হজম করতে না পারলেও তার কথায় আমি অবাক হলাম না। কারণ উত্তরটি আমি আগেও বহুবার শুনেছি।

প্রবাসে জন্ম নেওয়া কিংবা খুব ছোট বয়সে বিদেশে চলে আসা বাঙালি শিশুদের একটা বড় অংশ বাংলা শুনতে পারে, বুঝতে পারে, এমনকি দিব্যি বলতেও পারে। কিন্তু বাংলা পড়তে পারে না। তাদের কাছে বাংলা একটি শ্রুত ভাষা, পাঠের ভাষা নয়। বিষয়টি প্রথমে খুব গুরুতর মনে হয় না। কারণ ছেলেমেয়ে তো বাংলায় কথা বলছে। সমস্যা কোথায়?

সমস্যা আছে। বড় সমস্যা।

আমার পরিচিত এক বাবা গর্ব করে বললেন, "আমার মেয়ে বাংলা খুব ভালো বলতে পারে।"আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "হুমায়ুন আহমেদের কোনো বই পড়েছ?" সে বলল, "Who is Humayun Ahmed?" বাবার মুখের হাসি একটু ম্লান হয়ে গেল।

প্রবাসী বাবা-মায়েরা অনেক যুদ্ধ করেন। সংসার, চাকরি, বিল, মর্টগেজ, স্কুল, ট্রাফিক—সব সামলাতে সামলাতে রাত হয়ে যায়। তারপর সন্তানকে বাংলা বর্ণমালা শেখানোর দায়িত্বটা প্রায়শই আগামী সপ্তাহে চলে যায়। সেই আগামী সপ্তাহ আর আসে না।

শিশুটি বড় হতে থাকে। বাংলা ভাষা তার সঙ্গে আর বড় হয় না।

ছোটবেলায় "অ আ ক খ" শেখা যতটা সহজ, দশ কিংবা বারো বছর বয়সে সেটা তত কঠিন হয়ে যায়। ষোল বছর বয়সে গিয়ে বাংলা বর্ণমালা অনেকের কাছেই রসায়নের যুক্তির বলিহারি করা সূত্রের মতো মনে হয়।

ফলাফল হচ্ছে, দ্বিতীয় প্রজন্মের অসংখ্য প্রবাসী বাঙালি বাংলা সাহিত্যের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারে না।

তারা জানে "মা" শব্দের অর্থ কী। কিন্তু "মা" শব্দটি যখন কোনো গল্পের মধ্যে কান্না হয়ে আসে, তখন সেটি তারা আর অনুভব করতে পারে না।
তারা জানে প্রেম কী। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে প্রেম যেভাবে নীরব বিকেলের মতো এসে বসে, সেই অনুভূতিটা তাদের কাছে পৌঁছায় না।

তারা জানে বর্ষা কী। কিন্তু "বৃষ্টি পড়ার শব্দ" আর "বৃষ্টি পড়ছে"—এই দুই বাক্যের ভেতরের সূক্ষ্ম পার্থক্য তাদের কাছে হারিয়ে যায়।

অনেকে বলবেন, অনুবাদ তো আছে। কথাটি ঠিক। অনুবাদ আছে।

কিন্তু অনুবাদ অনেকটা কারো বিয়ের ভিডিও দেখার মতো। আপনি ঘটনাটি জানতে পারবেন, কিন্তু সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে বানানো কাচ্চি বিরিয়ানিটার স্বাদটা কোনোভাবেই পাবেন না।

ধরা যাক, কেউ লিখেছে—"তার চোখে জোছনা নেমে এলো।" ইংরেজিতে অনুবাদ করলে হয়তো লেখা হবে, "Her eyes glowed in the moonlight." ঘটনা একই। কিন্তু অনুভূতি কি একই?

আমার মনে হয় না।

ভাষা শুধু তথ্য বহন করে না। ভা ষা স্মৃতিও বহন করে, সংস্কৃতি বহন করে। মানুষের ভেতরের না-বলা গোপন আবেগও বহন করে। এই কারণেই হয়তো পৃথিবীর প্রায় সব জাতি তাদের মাতৃভাষাকে আঁকড়ে ধরে রাখে।

এখন প্রশ্ন হলো—সমাধান কী? সবাইকে নতুন করে বাংলা বর্ণমালা শেখানো? চেষ্টা করা যেতে পারে।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বিশ বছর বয়সী একজন তরুণ।বা তরুণীকে "ক্ষ", "জ্ঞ", "ঋ" শেখানো খুব আনন্দের কাজ নয়। শিক্ষকও ক্লান্ত হবেন, শিক্ষার্থী আরো ক্লান্ত হবে।

ক্ষ জ্ঞ ঋ

আমি বরংএকটি সহজ সমাধানের কথা ভাবি। বাংলা সাহিত্যকে ইংরেজি হরফে প্রকাশ করা। প্রথমে ধারণাটি শুনে অনেকে রাগ করতে পারেন। রাগ করার যথেষ্ট কারণও আছে। বাংলা ভাষার সৌন্দর্য তার নিজস্ব বর্ণমালায়।

আমি তর্ক করছি না। কিন্তু একটি প্রশ্ন করছি। কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

একজন পাঠক বাংলা বর্ণমালা না জানার কারণে পুরোপুরি সাহিত্য থেকে বঞ্চিত হবে! নাকি সে ইংরেজি হরফে হলেও মূল ভাষার স্বাদ গ্রহণ করবে?

ধরা যাক কেউ পড়ছে— "Amar shonar Bangla, ami tomay bhalobashi." এটি বাংলা লিপি নয়। কিন্তু এটি এখনও বাংলা। এখানে ভাষার হৃদস্পন্দন আছে। অনুবাদের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ পাঠক লেখকের ব্যবহৃত শব্দগুলোই পাচ্ছে। শব্দের পোশাক বদলেছে, শব্দগুলো বদলায়নি।

Amar shonar Bangla,
ami tomay bhalobashi.

আমার ধারণা, প্রবাসী দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সংস্করণ তৈরি করা যেতে পারে। যেখানে পুরো বই থাকবে ইংরেজি হরফে লেখা বাংলায়। প্রথমে ছোটগল্প। তারপর উপন্যাস। তারপর কবিতা।



হয়তো একদিন কোনো আধো কিংবা সিকি বাঙালি তরুণ নিউইয়র্কে বসে "Pother Panchali" পড়বে। কেউ মেলবোর্নে বসে জীবনানন্দের কবিতা পড়বে। কেউ টরন্টোতে বসে বাংলা গল্পে কাঁদবে।

তখন হয়তো সে বাংলা বর্ণমালা জানবে না। কিন্তু বাংলা অনুভব করবে। আমার কাছে সেটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ ভাষার শেষ ঠিকানা বর্ণমালা নয়। মানুষ।

একজন মানুষ যদি ভাষার অনুভূতি ধারণ করতে পারে, তাহলে ভাষা পুরোপুরি হারিয়ে যায় না। বরং সেখান থেকেই হয়তো নতুন যাত্রা শুরু হয়। মজার ব্যাপার হলো, আজকের প্রজন্ম এমনিতেই বাংলিশে অভ্যস্ত।

তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেসেজ লিখতে পারে—

“Koi acho?”

“Bari jachhi.”

“Khabar kheyecho?”

এই লেখাগুলো পড়তে তাদের কোনো সমস্যা হয় না।

কিন্তু একই মানুষকে যদি “কই আছো?”, “বাড়ি যাচ্ছি”, “খাবার খেয়েছ?” বাংলা হরফে লিখে দেওয়া হয়, তখন সে চুপ করে চেয়ে থাকে। এই চুপ করে থাকার মধ্যেই আমাদের সমস্যাটা লুকিয়ে আছে। এবংহয়তো সমাধানটাও।

আমি জানি, বাংলা ভাষার রক্ষণশীল অভিভাবকেরা এই প্রস্তাবে ভ্রুকুঁচকাবেন। তাদেরকুঁচকানো ভ্রু দেখেও আমি খুব বিচলিত নই। কারণ ভাষার সবচেয়ে বড় শত্রু পরিবর্তন নয়। ভাষার সবচেয়ে বড় শত্রু বিস্মৃতি।

ভাষার সবচেয়ে বড় শত্রু পরিবর্তন নয়। ভাষার সবচেয়ে বড় শত্রু বিস্মৃতি।

যদি কোনো তরুণ বাংলা বই স্পর্শই না করে, তাহলে আমরা ভাষাকে রক্ষা করলাম কোথায়? আমার মনে হয়, দরজা পুরোপুরি বন্ধ রাখার চেয়ে একটি জানালা খুলে রাখা ভালো।



ইংরেজি হরফে বাংলা সাহিত্য হয়তো সেই জানালাটাই খুলে দিতে পারে। সেদিন হয়তো কোনো প্রবাসীর ছেলে তার নিজের মেয়েকে বলবে, “আমি বাংলা পড়তে পারি না, কিন্তু তোমাকে একটা বাংলা গল্প শোনাতে পারি।”

‘একটা গোটা গঙ্গা নদী করব অনুবাদ’



ড. শাখাওয়াৎ নয়ন



একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা মানে কেবল শব্দের পোশাক বদলে দেওয়া নয়; বরংএকটি সংস্কৃতিকে অন্য সংস্কৃতির বোধ ও অভিজ্ঞতার জগতে পুনঃনির্মাণ করা। ভাষা নিছক যোগাযোগের মাধ্যম নয়; তার নিজস্ব সুর, ছন্দ, ইতিহাস, স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রয়েছে। একটি শব্দের আড়ালে কখনো লুকিয়ে থাকে শতাব্দীর ইতিহাস, একটি বাক্যের নীরবতায় জমা থাকে মানুষের দীর্ঘশ্বাস। ফলে অনুবাদ মূলত ভাষান্তরের পাশাপাশি একধরনের সাংস্কৃতিক পুনঃসৃজন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এই জটিল সৃজনপ্রক্রিয়ার সামনে এক অভূতপূর্ব সম্ভাবনা ও সংকট হাজির করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এআই কি কেবল অনুবাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করবে, নাকি একদিন সাহিত্যিক সৃজনশীলতারও বিকল্প হয়ে উঠবে?

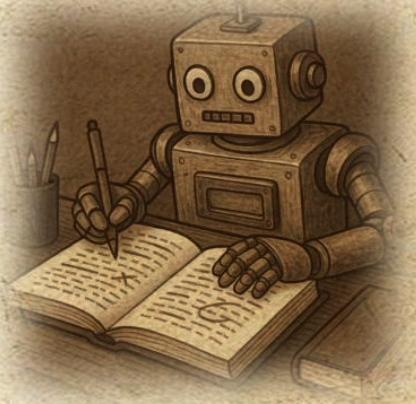
দাপ্তরিক নথিপত্র, তথ্যনির্ভর গদ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাষার অনুবাদে এআই ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। বাংলা ভাষাতেও জেনারেটিভ এআইয়ের কার্যকারিতা বিস্ময়কর। কিন্তু সৃজনশীল সাহিত্যের ভাষার ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক গভীর। বিশেষত দীর্ঘ ও জটিল বাক্যে যখন একাধিক ভাব, প্রতীক, সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ এবংঅর্থের স্তর পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, তখন এআই প্রায়ই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ উদ্ধার করতে পারলেও তার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা ও নান্দনিক সংগতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না।

ধরা যাক, ‘পাতা’ শব্দটি। গাছের পাতা, পায়ের পাতা, বইয়ের পাতা কিংবা কারও কাছে হাত পাতা—চারটি প্রয়োগে একই শব্দ চারটি ভিন্ন অর্থ বহন করছে। ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটি বহুর্থকতার (polysemy) একটি পরিচিত উদাহরণ। এআই এখন প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই এই অর্থগত পার্থক্য শনাক্ত করতে পারে। যথাযথ উদাহরণ, নির্দেশনা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য দিলে তার অনুবাদের মানও উন্নত হয়। কিন্তু শব্দের অভিধানগত অর্থ নির্ধারণ আর তার সাংস্কৃতিক ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করা এক বিষয় নয়। সাহিত্যিক অনুবাদের প্রকৃত সংকট এখানেই।

গাছের পাতা পায়ের পাতা বইয়ের পাতা হাত পাতা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* কিংবা কমলকুমার মজুমদারের *সুহাসিনীর পমেটম* ইংরেজিতে অনুবাদ করতে দিলে এই সংকট আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এসব রচনায় ভাষা কেবল কাহিনি পরিবেশনের বাহন নয়, বরং কাহিনির অবিচ্ছেদ্য শিল্পরূপ। ইলিয়াসের আঞ্চলিক ভাষা, লোকবিশ্বাস, শ্রেণি-চেতনা ও ইতিহাসের অন্তঃস্রোত কিংবা কমলকুমারের স্বতন্ত্র বাক্যগঠন, শব্দবিন্যাস ও ভাষিক দুরূহতা অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। এখানে আক্ষরিক বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে গিয়ে সাহিত্যিক সৌন্দর্য হারিয়ে যেতে পারে; আবার সাবলীলতার সন্ধানে মূল রচনার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও বিলুপ্ত হতে পারে।

অনুবাদতাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ *The Task of the Translator* (1923)-এ অনুবাদকে মূল রচনার নিছক অনুকরণ হিসেবে দেখেননি; বরং ভাষাগুলোর মধ্যকার গভীর সম্পর্ক উন্মোচনের একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অন্যদিকে লরেন্স ভেনুতি অনুবাদে সাংস্কৃতিক পার্থক্য মুছে ফেলার প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তাঁদের আলোচনার আলোকে বলা যায়, সফল সাহিত্যিক অনুবাদে শুধু অর্থের সমতুল্যতা নয়, ভাষার সাংস্কৃতিক অপরত্বও গুরুত্বপূর্ণ।



বিশেষত রূপক, উপমা, প্রতীক, শ্লেষ, বিদ্রূপ ও ব্যঞ্জনাময় ভাষা, যাকে সামগ্রিকভাবে *figurative language* বলা হয়—এআই অনুবাদের অন্যতম

কঠিন ক্ষেত্র। কবিতায় একটি নদী কখনো ভৌগোলিক বাস্তবতা, কখনো সভ্যতার স্মৃতি, কখনো বিচ্ছেদ কিংবা নির্বাসনের প্রতীক। লগ্নজিতা চক্রবর্তী’র গানের কাব্যিক উচ্চারণে ‘একটা গোটা গঙ্গা নদী করব অনুবাদ’—এই অভিব্যক্তির তাৎপর্য তাই শব্দান্তরের সীমা অতিক্রম করে। গঙ্গা এখানে শুধু একটি নদীর নাম নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরাণ, ধর্ম, ইতিহাস, জনজীবন, স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক চেতনার বহুস্তরীয় অনুষঙ্গ। এআই হয়তো বাক্যটির ইংরেজি প্রতিশব্দ নির্মাণ করতে পারবে, কিন্তু সেই অনুবাদে গঙ্গার সাংস্কৃতিক বিস্তার কতখানি অক্ষত থাকবে?

গঙ্গা এখানে শুধু একটি নদীর নাম নয়।

সাহিত্যের আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য লেখকের স্বতন্ত্র শৈলী। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ লেখকের নিজস্ব বাক্যপ্রকরণ, শব্দচয়ন, ছন্দ ও নীরবতার ভাষা রয়েছে। কোথায় ছোট বাক্য প্রয়োজন, কোথায় দীর্ঘ বাক্যের বিস্তার, কোথায় সেমিকোলন কিংবা দাঁড়ির বিরতি—এসব সিদ্ধান্ত কেবল ব্যাকরণের নয়, নন্দনতত্ত্বেরও। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের গতিময়তা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযম কিংবা কমলকুমারের বাক্যবিন্যাস একই নিয়মে অনুবাদ করা যায় না।

উল্লেখ্য, অনুবাদের দুর্বলতা শুধু যন্ত্রের একচেটিয়া সমস্যা নয়; মনুষ্য-অনুবাদেও অতিরিক্ত সর্বনাম, অব্যয় পদ—বিশেষত ‘এবং’, ‘ও’ কিংবা অপ্রয়োজনীয় ‘ই’-প্রত্যয় ও যতিচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। এসব কারণে অনুবাদ ব্যাকরণসম্মত হলেও তার স্বাভাবিক প্রবাহ ও সাহিত্যিক সৌন্দর্য ব্যাহত হতে পারে। এআই অনেক সময় ভাষাকে অতিমাত্রায় মসৃণ ও প্রমিত করতে গিয়ে লেখকের ইচ্ছাকৃত ভাষিক বিচ্যুতি, অসংগতি কিংবা নান্দনিক দুরূহতা, রহস্যময়তা মুছে ফেলে। অথচ সাহিত্যে সবসময় ‘ শেষ হয়েও হইল না শেষ’ ত্রুটি নয়; বরং শিল্পের উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর।

এআইয়ের অগ্রগতির ফলে অনুবাদকের পেশাগত পরিচয়ও পরিবর্তিত হতে পারে। ভবিষ্যতের অনেক অনুবাদক হয়তো ক্রমশ অনুবাদ-সম্পাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। এআই প্রাথমিক অনুবাদ করবে, আর মানুষ তার অর্থগত যথার্থতা, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা, ভাষিক সৌন্দর্য ও লেখকের স্বতন্ত্র শৈলী পুনঃনির্মাণ করবে।

কিন্তু এই নতুন প্রজন্মের সম্পাদক তৈরি হবে কীভাবে? শুধু দুটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলেই চলবে না; প্রয়োজন সাহিত্যতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতি ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। একই সঙ্গে প্রয়োজন মূল সাহিত্যকর্মের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনের
ক্ষমতা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাই এআই-সহায়ক সাহিত্য অনুবাদ, তুলনামূলক সাহিত্য ও সম্পাদনাবিদ্যার সমন্বিত পাঠক্রম প্রবর্তনের সময় এসেছে।

তবে জেনারেটিভ এআই সাহিত্যতত্ত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষিক বৈচিত্র্য এবং লেখকভিত্তিক শৈলীর বিপুল তথ্যভান্ডার ব্যবহার করে সম্পাদনার ক্ষেত্রেও ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতের বইয়ের প্রচ্ছদে হয়তো নতুন এক ঘোষণা যুক্ত হবে—*‘ইহা মনুষ্যলিখিত সাহিত্য’* কিংবা *‘মনুষ্যসম্পাদিত অনুবাদ’*।

‘ইহা মনুষ্যলিখিত সাহিত্য’

অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে একটি গভীর দার্শনিক প্রশ্ন: ভাষার পরিসংখ্যানগত নিয়ম আয়ত্ত করা এবং ভাষার মানবিক অর্থ অনুধাবন করা কি একই বিষয়? যন্ত্রের ভাষিক দক্ষতা যতই বৃদ্ধি পাক, এই প্রশ্নের সহজ মীমাংসা সম্ভব নয়।



চীনের Zhipu AI-এর GLM5.3 সিরিজের মতো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের বিকাশ আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার নতুন বাস্তবতা তুলে ধরছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার জন্য নিজস্ব লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল নির্মাণ কেবল প্রযুক্তিগত প্রয়োজন নয়; এটি ভাষিক সার্বভৌমত্ব ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণেরও প্রশ্ন। অন্যথায় বাংলা ভাষার ডিজিটাল ভবিষ্যৎ বহুলাংশে বিদেশি কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। পাশাপাশি বাংলা ভাষার জন্য টার্নিটিনের মতো কার্যকর চৌর্যবৃত্তি শনাক্তকরণ প্রযুক্তি উন্নয়ন জরুরি। তাছাড়া ভবিষ্যতের সাহিত্য সমালোচনায় মৌলিকত্ব, লেখকত্ব এবংসৃজনশীল দায়বদ্ধতার প্রশ্ন উঠবে।

এআই-নির্ভর অনুবাদ প্রযুক্তি ভাষিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মাতৃভাষায় বৈশ্বিক অংশগ্রহণের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। ইংরেজির একচ্ছত্র আধিপত্যের বিপরীতে বিপন্ন ভাষার সাহিত্য, জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে বিশ্বপরিসরে পৌঁছে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ মুষ্টিমেয় রাষ্ট্র ও কোম্পানির হাতে কেন্দ্রীভূত হলে ভাষিক মুক্তির পরিবর্তে নতুন ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ঘটতে পারে।

অনেকে মনে করেন, ভবিষ্যতে এআই নিজস্ব ভাষা বা যোগাযোগব্যবস্থা নির্মাণ করতে পারে। কিন্তু তা কি মানবভাষার সমতুল্য হবে? মানুষের ভাষা নিছক তথ্যবিনিময় নয়; বরংইতিহাস, সংস্কৃতি, ক্ষমতা, পরিচয়, আবেগ ও সামাজিক সম্পর্কের বহমান অভিব্যক্তি।

শেষ পর্যন্ত অনুবাদ সাহিত্যে এআইয়ের ভবিষ্যৎকে মানুষ বনাম যন্ত্রের সরল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। বরং প্রশ্নটি সাহিত্যিক সৃজনশীলতার প্রকৃতি, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব এবং ভাষার নান্দনিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। এক সময় এআই *খোয়াবনামা*’র চমৎকার ইংরেজি কিংবা ফ্রেঞ্চ অনুবাদ করবে, কমলকুমারের জটিল বাক্যবিন্যাসেরও গ্রহণযোগ্য ভাষান্তর করবে। কিন্তু সেই অনুবাদে বাংলার মাটির গন্ধ, লোকজ বিশ্বাসের রহস্য, মানুষের কান্না এবংইতিহাসের দীর্ঘশ্বাস কতখানি অক্ষত থাকবে?

একটা গোটা গঙ্গা নদী হয়তো একদিন এআই অনুবাদ করবে। কিন্তু সেই অনুবাদে গঙ্গার জল থাকবে, না শুধু তার নাম; নদীর প্রবাহ থাকবে, না কেবল তার ভৌগোলিক বিবরণ? সাহিত্যসমালোচনার ভবিষ্যৎ প্রশ্নটি সম্ভবত সেখানেই।

সেই অনুবাদে গঙ্গার জল থাকবে, না শুধু তার নাম;
নদীর প্রবাহ থাকবে, না কেবল তার ভৌগোলিক বিবরণ?

কারণ ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, মানুষের অস্তিত্বের সাংস্কৃতিক ভূগোল; সাহিত্যিক অনুবাদ সেই ভূগোলের সৃজনশীল পুনঃনির্মাণ। প্রযুক্তি অনুবাদকে সহজতর করে নতুন নান্দনিক সম্ভাবনা উন্মোচন করতে পারে। কিন্তু অনুবাদের প্রকৃত সার্থকতা নির্ভর করে একটি মৌলিক প্রশ্নে—আমরা কি শুধু শব্দের ভাষান্তর করছি, নাকি সেই শব্দের অন্তরালে বসবাসকারী মানুষের অনুভূতি, ইতিহাস ও অস্তিত্বকেও পৌঁছে দিচ্ছি?